চৈত্র ১৩৮৪

আনন্দমেলা

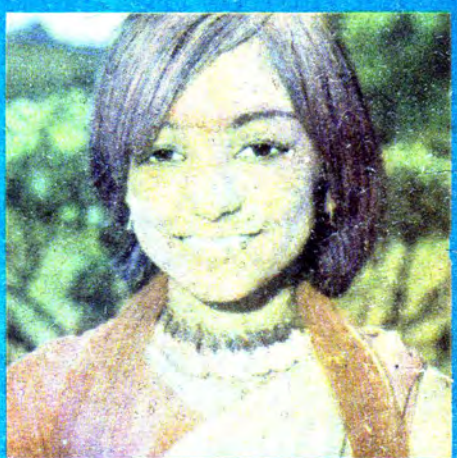

হেড এগজামিনারের
দশটি পরামর্শ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

আপনার একান্ত প্রিয় ও নির্ভরশীল বেঙ্গল কেমিক্যালের সামগ্রী

★ ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
★ পেটল গ্লিসারিন সোপ ★ সালফার সোপ
★ অগুরু ★ প্রিয়া পারফিউম ★ ডায়না স্যানিটারি ন্যাপকিন
★ ফিনিওল ★ অ্যাকোয়া টাইকটিস ★ কর্নাক ★ ইউথিরিয়া
★ অশ্বান ★ টেব্‌ল্ সল্ট ★ ন্যাপথলিন বল এবং
আরও অনেক কিছু

বেঙ্গল কেমিক্যাল

অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
(ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে)
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

ACIL-BC 1/78 BEN

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭
চৈত্র ১৩৮৪ মার্চ ১৯৭৮ তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা
দেড় টাকা

ছড়া ছড়া কাটার ছড়া। অজিত দত্ত ৯
দস্যু। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৪৮, উটকো-ছুটকো। সরল দে ৫২

পরীক্ষার্থীদের জন্য শেষ মুহূর্তের দশটি পরামর্শ। হেড এগজামিনার ১৯

গল্প পাক্কু, পাপাই ও পাখি। বলরাম বসাক ৭
টুবলুর গোয়েন্দাগিরি। মঞ্জিল সেন ৪৯
ভূতচতুর্দশী। অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য ৫১

ভ্রমণ-কাহিনী নারা। পবিত্র সরকার ৫, আজব দেশে। সুনীল দাশ ২৪

উপন্যাস বন্ধ ঘরের আওয়াজ। সমরেশ বসু ১৪, অলৌকিক। বিমল কর ৪৫

আত্মকথা খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ১১

কমিক্স ভুতুড়ে গাড়ি ১০, টারজান ২৬, টিনটিন ৩০, নোলেদা ৫৩

খেলাধুলো পাঞ্জাবকে বিধ্বস্ত করে বাংলা জিতল। পুষ্পেন সরকার ৩৬
বাংলাকে কীভাবে কোচ্ করেছি। অরুণ ঘোষ ৪০
ইন্দর কী বলে গেলেন। শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪১
মনে রাখার মতো টেস্ট সিরিজ। চিরঞ্জীব ৪২
বিশ্ব-হকিতে ভারত কি আবার চমক লাগাবে। সুব্রত সরকার ৪৩
খেলার খবর, ছবিতে ৪৪

লেখাপড়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের রেক্টর কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট বয় ৩৩

ধাঁধা-মজা-রহস্য আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফোটো ২৯
কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা মজার পড়া। কুন্তক ২০, তোমাদের পাতা ২১
ডোডো-তাতাই। তারাপদ রায় ২৫
বিশ্ব-বিচিত্রা। দিদিমণি ৪৪
আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪, শেখো। কারিগর ৫৪

প্রচ্ছদ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফুটবল-ক্রোড়পত্রের রঙিন ফোটোগুলি তপন দাশের তোলা

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

তোদাইজি মন্দির

কাসুগা মন্দিরের পাশে ছায়াময় সবুজ

কাসুগা মন্দির

জাপানের সুপার-এক্সপ্রেস লাইন দিয়ে ট্রেন ছুটছে

তোদাইজি মন্দিরের দইবুৎসো

কোফুকুজি মন্দিরের পাঁচতলা প্যাগোডা

নারা

পবিত্র সরকার

জাপানে এসেছি দিন তিনেক হল। টোকিয়োতে প্লেন থেকে নেমে আর বেশি জিরোইনি, কারণ দেশে জাপানী দু একটি বন্ধু বলে দিয়েছিলেন, সাবধান, জাপান দেখতে হলে আগে যাবেন কিয়োতোতে। টোকিয়ো এখন রাজধানী বটে—সেখানে উঁচু উঁচু বাড়ি, মস্ত চওড়া সব উড়াল-পথ, এয়ারপোরট থেকে হামামাৎসুজো পর্যন্ত আকাশ-রেল অর্থাৎ মনোরেল, গাড়িঘোড়া, ইফেল টাওয়ারের চেয়েও ১৩ ফুট উঁচু টাওয়ার—সবই আছে, সেই সঙ্গে আছে কোটিখানেকের মতো লোক—কিন্তু খাঁটি জাপান সেখানে কোথায়? জাপানের শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা, তার যা কিছু সুন্দর—সবই টিকিয়ে রেখেছে কিয়োতো। কাজেই টোকিওতে একটি মাত্র রাত কাটালুম, 'আজিয়া সেন্তার' অর্থাৎ এশিয়া সেনটারে, তারপর পরদিনই সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে কিয়োতোর ট্রেনে চড়ে বসলুম। অবাক কাণ্ড এই যে, এখানে স্টেশনের টিকিট-ঘর দোকানপাট ইত্যাদি সব একতলায়, কিন্তু ট্রেন এসে থামে দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে তোমাকে প্লাটফর্মে পৌঁছুতে হবে।

তার চেয়েও অবাক কাণ্ড হল ট্রেনগুলো। বাপস, সে কী ট্রেন! দুই যমজ ভাইয়ের মতো হিকারি আর কোদামা নামে দু-জাতের 'সুপার এক্সপ্রেস' ট্রেন টোকিয়ো থেকে দক্ষিণপুবে ওকায়ামা পর্যন্ত ছুটোছুটি করে। পথে কিয়োতো, ওসাকা আর আরো দু-একটা স্টেশন তারা ছুঁয়ে যায় বটে, কিন্তু তাদের থামার চেয়ে দৌড়টাই বেশি দেখবার। আর দৌড় কি সামান্য দৌড়? এক ঘণ্টায় দুশো দশ কিলোমিটার, মানে প্রায় একশো ত্রিশ মাইল ছোটে তারা—পৃথিবীতে এমন দৌড়বাজ ট্রেন আর নেই। ব্যাপারটা ভাবলেই মাথা ঝিমঝিম করে, কিন্তু ভেতরে গিয়ে গদিয়ান হয়ে বোসো, যেন এরোপ্লেনের পেটের মধ্যে ঢুকলে। আর সে-ট্রেনের ব্যবহার এত ভাল যে, টেরই পাবে না তার ঘোড়দৌড়। শুধু চওড়া কাচের জানলা দিয়ে দেখবে দুপাশে কাঠের বাড়িঘর খেতখামার নদী হ্রদ পাহাড় পর্বত একেবারে বাঁইবাঁই করে উল্টোদিকে ছুটছে। এমনি করে টোকিয়ো ছাড়ার একটু পরেই সাদামাথা ধ্যানী ফুজিয়ামা পাহাড় চক্ষের পলকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন যেন, ভাল করে আলাপই হল না।

এইটে জাপানীদের খুব অহংকারের জিনিস যে, গতি তো পাওয়াই হল, তার সঙ্গে একটু শান্তিও চাই, স্বস্তিও চাই। জানলায় বসে তুমি দ্যাখো বৃষ্টি নেমেছে, কিন্তু বৃষ্টির ধারা জানলার কাচে ওপর থেকে নীচে নামছে না। তা বয়ে যাচ্ছে ডাইনে থেকে বাঁয়ে—ট্রেনের দৌড় তাদের যাবতীয় মাধ্যাকর্ষণ গুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভেতরে তুমি ঐ প্রচণ্ড গতির কিছু টের পাচ্ছ? মোটেও না! একটু মৃদু কাঁপুনি, একটি অস্ফুট গুঞ্জন—ব্যস্, ঐ যা কিছু। কামরার ভিতরকার প্রশস্ত পথ ধরে গটগট করে হেঁটে বেড়াও, ট্রলি চালিয়ে যে ভেণ্ডার আসছে তার কাছ থেকে কোকা কোলা বা কাজুবাদাম নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করো, মনে হবে তুমি তোমার স্বপ্নের বৈঠকখানার মধ্যেই আছ, কোথাও কিছু অসুবিধে নেই।

হঠাৎ মনে পড়ল মার্কিনদেশের এক ট্রেনযাত্রার কথা। অ্যামট্রাক কম্পানির একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে ফিলাডেলফিয়া থেকে শিকাগো ফিরছি। গাড়ি দৌড়চ্ছে, সেই সঙ্গে বিকলাঙ্গ কাঁকড়ার মতো তার সর্বাঙ্গে খটাখট ঝাঁকুনি হচ্ছে, ভয় হচ্ছে নিজের সঙ্গে নিজের ঠোকাঠুকি হয়েই সে বুঝি অ্যাকসিডেনটে মারা পড়বে। বেদম ঝাঁকুনির চোটে আমরা কাহিল। উঠে কোথাও যেতে হলে তুমি পাঁচবার কামরার দেয়ালে মাথা ঠুকবে, তিনবার সহযাত্রীকে গুঁতিয়ে দেবে, অন্তত দুবার ধপাস করে কারো-না-কারো কোলে বসে পড়বে, আর দরজার কাছাকাছি গেলে মনে হবে ট্রেনটা তোমাকে ঝটকা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার বীভৎস ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এইরকম এক যাত্রায় দেখি উল্টোদিকের সীটে বসে একটি বছর তিনেকের ফুটফুটে মেয়ে একটি কলা খাবার চেষ্টা করছে। সেই 'চেষ্টা'র দৃশ্যটি আমি এ জীবনে ভুলব না। অর্ধেক ছাড়ানো কলাটি প্রথমে তার ডান গালে লেগে একটু থেঁতলে গেল, তার পরে বাঁ গালে আর একটু এবং তার পরেই নাকের ওপর গিয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল—মুখে আর গিয়ে পৌঁছল না। মেয়েটির বাবা-মা হাসছে, আমরা হাসছি, মেয়েটিও খিলখিল করে হাসছে, যদিও তার চোখে জল। এমন সময় সে-ট্রেন তীব্রস্বরে 'পোঁ-ওও' করে হুইসল বাজিয়ে ঠাট্টা করে উঠল।

জাপানের এই সুপার এক্সপ্রেসে গতি আছে, অথচ অস্থিরতা নেই। কিয়োতোতে যে বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি তাঁর নাম তাদাশি ওতো। থাকেন ইউকিউ-কো অঞ্চলে। পাড়ার নাম সাইন। তিনিই প্রস্তাব দিলেন—আজ তাঁর বাবার কিমোনোর ব্যবসার সূত্রে ওসাকা যাবেন, আমাকে যাবার সময় নারাতে নামিয়ে দিয়ে যাবেন, ফিরতি পথে তুলে আনবেন। আমি তো উল্লাসে আটখানা। সকালে তৈরি হয়ে তাঁর নতুন তোয়োতা গাড়িতে ঢুকে পড়লুম, রাজহংসের মতো সেই গাড়িও একটু পরে শহর থেকে বেরিয়ে তোকাইদো এক্সপ্রেসওয়েতে ঢুকল। দেখতে দেখতে ওডোমিটারে অর্থাৎ মাইল গোনবার কাঁটায় প্রায় সত্তর মাইল অর্থাৎ একশো বারো কিলোমিটারের মতো স্পীড উঠে গেল। হঠাৎ ওতো মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গাড়ির ভেতরে কোনোরকম আওয়াজ পাচ্ছেন?" আমি কান পেতে কোনো শব্দ না পেয়ে বললুম, "কই, না!" আবার ওতো জিজ্ঞেস করলেন, "কোনোরকম ঝাঁকুনি লাগছে?" আমি সোফায় পুরো গা এলিয়ে দিয়ে অনুভব করলুম, মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে সহর্ষে ছুটেছে তোয়োতা, যেন পক্ষীরাজ উড়ছে আকাশে। কোথাও কোনো খুঁত নেই। বললুম "কিসের ঝাঁকুনি?" ওতোর মুখ নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় ভরে গেল, গাড়ির রেডিয়োর গানের তালে তালে স্টিয়ারিঙে বাঁ-হাতের আঙুল বাজাতে লাগলেন তিনি।

কিয়োতো থেকে নারা মাত্র চল্লিশ কিলোমিটারের মতো, দেখতে দেখতে এসে গেলাম।

স্টেশনের কাছে নেমেছি। বাস ধরে এসে নামলুম তোদাইজি মন্দিরের সামনে। নারা জাপানের প্রথম স্থায়ী রাজধানী, এখানে ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজধানীর পত্তন হওয়ার আগে এক-এক রাজা এক-এক জায়গায় রাজধানী বসাতেন। ৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর এ শহরে রাজধানী ছিল। এখন কিন্তু দেখলে রাজধানী নগর বলে আদপেই মনে হয় না। রাজপ্রাসাদ নেই, মস্ত মস্ত বাড়িঅলা প্রশস্ত রাজপথ নেই, লোকের ভিড় নেই—যেন বিশাল একটি উদ্যান এই নারা। মাঝে বেশ কিছু মন্দির ছিটোনো, তার কয়েকটি প্যাগোডা, একটি বিশাল পুকুর। ঘনবসতির আধুনিক শহর-বাজার আছে বটে, কিন্তু তা যেন এই মন্দিরখচিত উদ্যান-শহরটির বাইরে। অতিশয় যত্নে কোনো ঐশ্বরিক স্থপতি তাকে আলাদা করে রেখে দিয়েছে। মন্দিরের নারা সবুজ ঘাসের রাজধানী, হেমন্তের সোনালি আভা লাগা সীডার আর ওক গাছের ঝরাপাতার রাজধানী। টুরিস্ট বাস আর গাড়িঘোড়া তার সীমানায় এসে শ্রদ্ধায় থেমে যায়, ফলে পায়ে হেঁটেই দেখতে হয় এই সুরম্য শহর। ৫

তোদাইজি মন্দির পৃথিবীর সব চাইতে বড় কাঠের মন্দির। তৈরি হয়েছিল বারোশো পঁচিশ বছর আগে। তার স্থাপত্য বাংলাদেশের গ্রামের আটচালা ঘরের মতো, কিন্তু তার বিশালতা, তার খিলান, থাম অলিন্দ ও ছাদের বিন্যাস ও কারুকার্যের বর্ণনা দেওয়া মুশকিল—ছবি থেকে বুঝে নাও। মন্দিরের মূল চত্বরে ঢোকার আগেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়ে ছিলুম, এমন সময় পেছনে গুঁতো খেয়ে চমকে উঠলুম। পথে দাঁড়িয়ে আছি, হয়তো কোনো বাচ্চা ঠেলে এগিয়ে যেতে চায়—এই ভেবে ব্যস্ত হয়ে পেছন ফিরে দেখি, শিশুই বটে তবে হরিণশিশু। তোমরা ভাবছ, কী মুশকিল, আবার হরিণ আসে কোত্থেকে? আসলে বলতে ভুলে গেছি যে, এই উদ্যানময় শহরটিতে প্রচুর হরিণ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুখের কথা এই, তাদের বেশির ভাগই চিত্রল জাতের আর তাদের শিং গজানোয় প্রশ্রয় খুব একটা দেওয়া হয় না। তাই বলে সকলের স্বভাবই কি আর আশ্রমমৃগের মতো? আমার এই আলাপী হরিণশিশুর কথাই ধরো না কেন, কোমরে বেশ লেগেছিল তার কপালের ধাক্কায়। অভিমান নিয়ে তাকে বলবার চেষ্টা করলুম, ছিঃ, স্বয়ং বুদ্ধের আশ্রয়ে এমন হিংসা দেখাতে নেই। বলতে গিয়ে দেখি সে অদৃশ্য। একটি মার্কিনী ভদ্রমহিলা পাশের কাপড়ের ছাউনি দেওয়া দোকান থেকে ছোট এক ব্যাগ ময়দা না কিসের গুলি কিনে বাড়িয়ে ধরেছেন, আমার হরিণশাবকটি দুলাফে তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে। আর সে একা নয়, আরো আট-দশটি হরিণের বিশাল এক বাহিনী দেখতে দেখতে ভদ্রমহিলাকে ঘিরে ফেলল, ভদ্রমহিলা 'গো অ্যাওয়ে, গো অ্যাওয়ে, য়ু রাফিয়ানস' বলে সাফল্যমণ্ডিত পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করতে-করতে ব্যাগট্যাগ ছুঁড়ে দৌড়ুলেন।

কাজেই মন্দিরে ঢুকে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল। মন্দিরে ঢুকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে মাথা এবং মন একসঙ্গে নত হয়ে এল। মন্দির আর কারো নয়, স্বয়ং 'দইবুৎসো'র অর্থাৎ মহান্ বুদ্ধের। মহান্ কথাটি আত্মিক এবং শারীরিক দু দিক থেকেই সত্য। ধর্মোপদেশ দেওয়ার মুদ্রায় এই বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তিটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধমূর্তিগুলির অন্যতম—প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। ৪৩৭ টন ব্রোঞ্জ, ৭৫ কেজি পারদ, ১৩০ কেজি নিখাদ সোনা, ৭ টন উদ্ভিজ্জ মোম লেগেছিল এই মূর্তিটি তৈরি করতে। এ মূর্তির রচয়িতা কিন্তু জাপানী ছিলেন না, ছিলেন কুনিনাকা-নো-কিমিমারো নামে একজন কোরীয়—একথা শুনে আশ্চর্য হলুম।

সেখান থেকে গেলুম কাসুগা মন্দিরে। এটির থাম আর ছাদের ফ্রেম উজ্জ্বল সিঁদুর রঙের, চারপাশের সবুজের মধ্যে সেটা একটা চমৎকার বর্ণাঢ্যতা তৈরি করে রেখেছে। এ-মন্দিরেরও বয়েস বারোশো বছরের বেশি। মন্দিরে ঢোকার দীর্ঘ ছায়াময় পথের দুপাশে অজস্র পাথরের লণ্ঠন বসানো, শুনলাম তিন হাজারের মতো এরকম লণ্ঠন রয়েছে সবসুদ্ধ। কাসুগা মন্দিরে আছেন প্রাচীন ফুজিওয়ারা পরিবারের গৃহদেবতা, এখন জাপানীরা তাঁর কাছে সুখসম্পদ ও কল্যাণ চাইতে আসে, লণ্ঠনের মধ্যে মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। এখানেও হরিণ আছে, নারাতে কোথায় নেই তারা? তবে ফটোগ্রাফাররা তাদের নিয়ে চমৎকার ব্যবসা ফেঁদেছে। তারা তোমাকে ফটো তোলার জন্যে ধরাধরি করবে, তুমি রাজী হলেই তোমাকে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তারা তোমার পায়ের কাছে ঐ ময়দা না কিসের গুলি ছড়িয়ে দেবে। এক দঙ্গল হরিণ এসে তা খেতে শুরু করে দেবে, আর অমনি ফোটোও উঠে যাবে তোমার শকুন্তলার পোজে। মন্দির দেখে ফেরার পথেই তুমি তৈরি ছবি পেয়ে যাবে।

ডাঙায় যেমন হরিণশিশু, জলে তেমনি পোনামাছ আর কচ্ছপ। কফুকুজি মন্দিরের পাঁচতলা প্যাগোডা দাঁড়িয়ে আছে সরুসওয়া নামে বিশাল এক সরোবরের ধারে। প্যাগোডা দেখব কী, পুকুরের ঢালু পাড়ে কচ্ছপদের সদলবলে রোদ পোহানো দেখেই আমি তাজ্জব। তারা অবশ্য হিংস্র নয়, কিন্তু খাবারদাবারের দিকে তাদেরও বিলক্ষণ নজর রয়েছে দেখলুম। আর সেই গুলির লোভে পোনামাছের সম্প্রদায়ও তীরের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। ছেলেবুড়ো সকলেই দেখি তাদের নিয়ে খেলায় মত্ত।

পুকুরের উত্তরে আছে তিনতলা আর-একটি প্যাগোডা। এটি অসাধারণ সুন্দর দেখতে, এর একতলায় দেয়ালে একসময় নাকি এক হাজার বুদ্ধের ছবি আঁকা ছিল, এখন তা খুবই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আর দেখলুম নান-এদো হোকুএনদো নামে দুটি বড়ো হলঘর, নারার জাতীয় সংগ্রহশালা, শিনইয়াকুশিজির মন্দির। মন্দির-টন্দির দেখে একটু ক্লান্ত হয়ে বাজারে ঢু দিলুম একটু। রেশম নারার একটি প্রধান উৎপাদন, পোশাক-আশাকের দোকানই বেশি। একটি দোকানের সামনে এমন একটি জিনিস দেখলুম, যা দেখে আবার থমকে দাঁড়াতে হল।

সে একটি দৈত্য। যেমন মোটা, তেমনি দীর্ঘকায় জাপানী একটি, হেঁড়ে গলায় দোকানে লোক ডাকছিল হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে। অবাক হলাম এই জন্যে যে, গত তিনদিনে যে কয়েক হাজার জাপানী দেখেছি তাদের মধ্যে না দেখেছি এত মোটা কাউকে, না দেখেছি এত লম্বা। বিদেশী পর্যটকরা তার দিকে তাকাতে-তাকাতে যাচ্ছিল, সে তাতে বেশ খুশিই হচ্ছিল বোঝা গেল।

ফেরার পথে ওতোকে দৈত্যটির কথা বললুম। ওতো একটু ভেবে বললেন, বোধহয় জাপানী নয়। হাওয়াইয়ান হতে পারে। হাওয়াইয়ানরা বদখত মোটা হয়।

পাক্কু, পাপাই ও পাখি

বলরাম বসাক

চুনিমামার ড্রয়ারে পাপাই হাত ঢুকিয়ে দিল। টেনে বার করল ফিতে বাঁধা এক ঝাঁক কাগজ। খস্ খস্ করে একটা কাগজ ছিঁড়ে জামার তলায় লুকিয়ে ফেলল চুপি-চুপি। তারপর পা টিপে টিপে রেণুমাসীর ঘরটা পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে এক ছুট। সোজা বাগানে চলে এল পাপাই। একটা টিনের ক্যানেস্তারা দিয়ে খরগোশের ঘর তৈরি করছিল পাক্কু। পাপাই হাসতে-হাসতে কাগজটা বার করে বলল, "এই যে দাদা, এনেছি। তুই পাখি বানিয়ে দিবি বলেছিলি।"

"পরে, পরে। এখন রাখ্।" পাক্কু বলল, "দাঁড়া খরগোশের ঘরটা শেষ করে নি।"

"কোথায় রাখব কাগজটা? আমার যে পকেট নেই।"

"দে তবে।" পাক্কু নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল, "ওমা, কিসের কাগজ— কোথায় পেলি?"

"কেন, এ কাগজে কি পাখি হবে না?"

"হবে না মানে? দাঁড়া—।" খরগোশের ঘর বানানো বন্ধ রাখল পাক্কু, "আমি যে-কোন কাগজে পাখি বানাতে পারি।"

পাপাই চোখ দুটো বড় বড় করে দেখল, ওর দাদা কেমন করে যেন কাগজটাকে চারকোনা করে কেটে ফেলল। তিনবার ভাঁজ করল। তারপর কোথায় কী মুড়ল। একটা সুন্দর লেজ জুড়ে দিয়ে তৈরি করে ফেলল কাগজের পাখি। অমনি পাপাই খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। পাক্কু পাখিটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিল খুব জোরে। কিন্তু ভাল উড়ল না। ঘুরতে-ঘুরতে পড়ে গেল। আবার ছুঁড়ল। আবার পড়ে গেল। খুব রেগে গেল পাক্কু। ছোট ভাই পাপাইয়ের কাছে মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে? "ইশ্, তাই তো, পাখিটা উড়ছে না কেন? বড্ড বেয়ারা পাখি তো. দেব লেজ কেটে।" পাখিকে খুব ধমকে দিল পাক্কু। পাপাই খিলখিল করে হেসে উঠল। আরে, কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে কাগজের পাখির লেজটা সোজা হয়ে গেল। ঠোঁটটা নড়ে উঠল। পাখা দুটো খাড়া হয়ে গেল। তারপর যেই না দমকা বাতাস এল, অমনি কাগজের পাখি শোঁ করে উড়ে চলল।

উড়ে যাচ্ছে কাগজের পাখি। উড়ে যাচ্ছে।

পাপাই খুশিতে হাততালি দিচ্ছে। পাক্কু ছড়া কাটছে "আয়রে পাখি লেজ ঝোলা, তোকে খেতে দেব দুধ-ছোলা।"

কিন্তু পাখি আর এল না।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ল পাপাই। পাখিটাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। পাক্কুরও মনটা খারাপ হয়ে গেল, শুধু বলল, "যাক্ গে, কাঁদিস নে পাপাই। তোকে আরেকটা পাখি বানিয়ে দেব।"

কাগজের পাখি কিন্তু খুউব খুশি। ছিল একটা কাগজ তাও ড্রয়ারের ভেতর পড়ে থাকতে হত। "এখন আমি পাখি হয়ে আকাশে কেমন উড়ছি! কী মজা।"

তখন কী সুন্দর বাঁকা চাঁদের মত পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছিল তালবাতাসী পাখি। কাগজের পাখিকে বলল "উড়তে চাও? বেশ তো এসো, তালগাছটার চারধারে ঘুরে-ঘুরে ওড়া যাক্।"

কাগজের পাখিটার খুউব ইচ্ছে ছিল তালবাতাসীর সঙ্গে উড়তে। কিন্তু পারল না। ধপাস করে পড়ে গেল গুণ্টিফল গাছে। আবার উড়বার চেষ্টা করল। একদম পারল না। আবার চেষ্টা করল। পারল না। মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল কাগজের পাখির। তার উপর যা চেঁচামেচি! গাছটাতে কতগুলো কাক জটলা পাকিয়ে এমন হৈ চৈ করছে!

"আহ্ থামো না। কেন এত চেঁচামেচি করছ?"

সব কাক এক সঙ্গে চুপ করে গেল। ঘাড় কাত করে বারবার কাগজের পাখিটাকে দেখল। একটা কাক লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এল, "কা-কা-কি কী বলছ? চেঁচামেচি?" সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাক এগিয়ে এল, "কোক্ কোক্, কোথ্ থেকে এসেছ ভাই?"

"কিক্ কিক, কিচ্ছু জানো না দেখছি।" বলল আরো একটা কাক। পেছনের কাকটা ঝপাস করে লাফিয়ে পড়ল ডালে, "কাওক্ কাওক্, মানে গায়ক গায়ক, আমরা গায়ক," বলতে লাগল কাকটা, "আমরা সবাই মিলে গান করছিলাম। কালাক কালাক্ কাওক্ কাওক অনেক কাল থেকে আমরা গায়ক, গান গেয়ে যাচ্ছি,—কবেক্ কবেক, সেই কবেকার কথা, আমাদের দাদুর দাদু—তাঁর দাদু—তাঁর দাদু খুব নামকরা গাইয়ে ছিল, একবার এক শেয়াল পণ্ডিত এসে কী প্রশংসা করেছিল তাঁর, বলেছিল, আহা, কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। হবেই তো। আমাদের দাদুর দাদু—তাঁর দাদু—তাঁর দাদু তখন একটা সন্দেশ খাচ্ছিলেন কিনা।"

"কাঁও কাঁও। গাও, তুমিও গাও," বলল একটা কাক। গান গাইতে বলছে কাগজের পাখিকে। চারদিকে কাকগুলো তাকে এমন করে ঘিরে ধরেছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

"কিই-কিই, কী ব্যাপার? পাখি হয়েছ, গান জানো না?"

"এসো, তোমাকে গান শিখিয়ে দিই। বলো, কা-কে-কি-কু-কোক্-কোক-কোক।"

কাগজের পাখির মুখ চুন হয়ে গেল। এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে ভাল হত।

ঠিক তক্ষুনি দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল। শাঁ করে উড়ে চলল কাগজের পাখি। হাঁ করে বসে রইল কাকের দল। দেখল, কাগজের পাখি উড়ে যাচ্ছে কৃষ্ণচূড়া গাছ পেরিয়ে, রাধা-চূড়া গাছ পেরিয়ে, কুন্তীপলাশ গাছ পেরিয়ে অনেক দূরে।

এদিকে হয়েছে কী, চুনিমামা কোর্ট থেকে ফিরে এসেই হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে, "হায় হায়, কী সব্বোনাশ হয়ে গেল। এখন আমি কী করি...?"

"কী হয়েছে? কিসের সব্বোনাশ?" রেণুমাসী ছুটে এল।

"রমেশচন্দ্রের দলিলের একটা ইমপরটেন্ট্ পাতা খুঁজে পাচ্ছি না। কাল রমেশচন্দ্রের কেস্ ফাইল হবে।"

হৈচৈ শুনে ছোটমামী, লীনামাসী, দিদিমা সবাই ছুটে এল। "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

"আমার ড্রয়ার খুলে দলিলের পাতা কে ছিঁড়ল?" চুনিমামা এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটোছুটি করতে লাগল, "বত্রিশ লাখ টাকার মামলা, ওহ্ আমার যে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে।"

সবাই খুঁজতে লাগল এদিকে ওদিক, "কে ছিঁড়বে? কেন ছিঁড়বে? অতগুলো টাকার মামলা। ষড়যন্ত্র নয় তো?"

"তোমরা এতগুলো লোক কী করছিলে? ঘাস কাটছিলে?" খুব বকাবকি শুরু করে দিল চুনিমামা।

পাক্কুর বুক ঢিব্‌ঢিব্ করতে লাগল। পাপাই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল বলে, তক্ষুনি পাক্কু ঠোঁটে আঙুল রেখে পপাইকে বলল, "চুপ চুপ। টুঁ-শব্দটি করিসনি। তোকে তাহলে ভীষণ মারবে।" পাক্কু পাপাইকে বাগানের বাইরে নিয়ে এল। "চল্, কাগজের পাখিটা নিশ্চয়ই এদিক সেদিক কোথাও পড়েছে। খুঁজে বার করি।"

কাগজের পাখি তখন নেমে এসেছে পাকুড় গাছে। সঙ্গে সঙ্গে সাদা খয়েরি পাখাওলা বাদামি হাঁড়িচাচা গাছের ভেতর ছিল, চেঁচিয়ে উঠল, "কেঁ কেঁ কেঁ কেঁ কেঁ কেঁ!" কাগজের পাখির বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠল। নাহ্, এখানেও ঠিক সুবিধে হবে না। তাই দমকা হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে আবার উড়ল। চলে এল আমলকী গাছে। তক্ষুনি কোথা থেকে ছুটে এল কালো-মাথা লাল-টুকটুকে-গা, বুলবুলি। "হুইট্ হুইট্ হু আর ইউট্...।" ছুটে এল সাদা-ঢেউ কালো-ঢেউ পাখাওলা রামগাঙরা পাখি। কী সুন্দর পাখিটা, ওর কালো মাথায় সাদা কাজল, কালো বুক, সাদা পিঠ, বলল, "হুইচিচি হুইচিচি, তুই কে, চাই কী?" আরো কত পাখি উড়ে আসছে রঙবেরঙের। সাদা-পেটওলা, খয়েরি খাড়া-লেজ, ছোটমতন দেখতে টুনটুনি তখন কী করছিল? তার সরু ঠোঁটে দুটো বড় বড় সবুজ পাতা সেলাই করছিল গাছের সরু আঁশ দিয়ে। এমনি করে বানাচ্ছিল চমৎকার একটা বাসা। হৈচৈ শুনে ছুটে এল কাগজের পাখির কাছে, "টুইট্-টুইট্-টুই তুই?"

লেজটাকে পাখার মত খুলে আবার বন্ধ করে, এদিকে দুলিয়ে ওদিকে দুলিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে নাচছিল নাচন-পাখি পায়ে ভর দিয়ে। হঠাৎ নাচ থামিয়ে দিয়ে ডাকল, "চাক-চাক-চাক।" খেজুর গাছে খেজুর পাতা চিড়ে, তার সঙ্গে নানারকম খড়কুটো দিয়ে উল্টানো কুঁজোর মত বাসা বুনছিল বাঁবুই। নাচন-পাখির ডাক শুনে ছুটে উড়ে এল। জলার ধারে লাল-নীল রঙের মাছরাঙা পাখি মাছ ধরবে বলে চুপটি করে বসে ছিল, সেও উড়ে এল। ঠুক্ ঠুক্ করে ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে গাছের গুঁড়ি ফুটো করছিল হলদে-মাথা সাদা-কালো কাঠঠোকরা, হৈ-চৈ শুনে সেও থাকতে পারল না। বেগুনি-পিঠ হলদে-পেট ঘোটুসি তখন সাদা ফুলে ঠোঁট ছুঁয়ে মধু খাচ্ছিল, সে-ও উড়ে এল। সবাই কাগজের পাখিকে ঘিরে ধরল, "তুমি কী রকম পাখি?"

"আমি কাগজের পাখি।"

"তুমি বাসা বুনতে পারো?" "তুমি নাচতে পারো?" "তুমি মাছ ধরতে পারো?" "তুমি পাতা সেলাই করতে পারো?" "তুমি ফুল থেকে মধু খেতে পারো?" "তুমি সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ফিরে পোকা ধরতে পারো?" "কাঠ ফুটো করতে পারো?"

কাগজের পাখি একেবারে বোবা। একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে না। ইশ, আরো পাখি উড়ে আসছে। "টি-টি" ডাকতে ডাকতে তুলোফুড়কি পাখি। "চিরব্ চিরব্" ডাকতে ডাকতে দোয়েল পাখি। নীল-মাথা নীল - ঝুঁটি সাদা দুধরাজ পাখি, "চি-চুট্ চি-চুট্...।" সবুজ ঘাসের মত রঙ বেগুনি-কালো ছোপওলা হরিয়াল পাখি। কালোমাথা সোনারঙ বেনেবউ। "টুউ-উ-ক্ টুউ-উ-ক্" ডাকতে ডাকতে বসন্তবৌরী। "টু-ই-ই-ই টু-ই-ই-ই" ডাকতে ডাকতে লাল টুক্‌টুকে লালটুঁটি। "টিইইইট টুইইইট্" ডাকতে ডাকতে সবুজ বাঁশপাতা পাখি। সবাই কিচির-মিচির করে কাগজের পাখিকে বলতে লাগল, "তোমার গায়ে লাল রঙ নেই কেন? নীল রঙ নেই কেন? কালো রঙ কোথায়? তোমার পাখায় খয়েরি রঙ নেই কেন? সবুজ রঙ কী হল? নীল ঝুঁটি নেই কেন? লেজে বাহার কোথায়?"

কাগজের পাখি কেঁদে ফেলল। তার কিছুই নেই। ইচ্ছেমত উড়তে পারে না। গান গাইতে পারে না। নাচতে পারে না। বাসা বুনতে পারে না। টুই-টুই করে ডাকতেও পারে না। পাখি হয়ে কী লাভ হল? "আমি পাখি হতে চাইনি, পাক্কু আর পাপাই, দুটি দুষ্টু ছেলে আমাকে পাখি করে দিয়েছে, তা নইলে চুনি-মামার ড্রয়ারে আমি বেশ ছিলাম, রমেশচন্দ্রের দলিলের প্রথম পৃষ্ঠা হিসেবে আমি ভালই যত্ন আত্তি পেতাম। আমি আবার সেরকমটি ফিরে পেতে চাই।" বলে কাগজের পাখি কাঁদতে লাগল। একটু পরে দমকা হাওয়ায় কাগজের পাখি আবার উড়ে চলল।

এদিকে বাড়ি তোলপাড়। দলিলের পাতা চুরি—সবাই হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে। পাক্কু পাপাই ভয়ে-ভয়ে পড়ার ঘরে বসে চুপিচুপি সবচাইতে শক্ত বই ইংরেজি গ্রামার পড়তে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ পাক্কু কান পেতে শুনল, চুনিমামা চিৎকার করে বলছে, "কাগজটা যখন পাওয়া গেল না, তখন আর উপায় নেই। আমি থানায় চললুম। পুলিসে খবর দিতে চললুম।"

পাক্কু আর থাকতে পারল না। গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। তার ছোট্ট ভাই পাপাই একেবারে কিচ্ছু বোঝে না। ওকে যদি পুলিস মারে, ওর ভীষণ লাগবে। থম্‌থমে মুখ করে পাক্কু আস্তে আস্তে চলে এল চুনিমামার কাছে, "আমি, আমিই তোমার ড্রয়ার খুলে দলিলের পাতা ছিঁড়েছি, পাখি বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি।"

"কী? দলিলের পাতাটা তুমি, তুমি ছিঁড়েছ? পাখি বানিয়েছ? উড়িয়ে দিয়েছ?"

পাক্কু কেঁদে ফেলল, "হ্যাঁ, আমিই। আমাকেই মারো, আমাকেই খালি মারো—।"

পাপাই ছুটে এসে জুলজুল চোখে দাদার দিকে তাকায়, তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

কাগজের পাখিটা তো ফিরে আসতেই চায়। যদি ঠিক এই সময়েই ফিরে আসত! অথচ পাখিটা ঠিকই ফিরে এসেছিল। রাত্রিবেলা চুনিমামা একবার সিগারেট কিনতে বেরিয়ে, কী উপায় করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটছিল, কাগজের পাখিটা তখন তার কাঁধের ওপর ঠক্ করে পড়ল। তারপর মাটিতে। চুনিমামা কিন্তু টের পায়নি।

ছবি বিমল দাস

ছড়া কাটার ছড়া

অজিত দত্ত

ঘুড়ি-কাটাকাটি এক মজাদার খেলা
কথা-কাটাকাটি হলে বড়ই ঝামেলা।
কাটাকুটি খেলো যদি জিরো আর ক্রসে
সময়টা কেটে যাবে বেশ ঘরে বসে।
বর্ষাটা কেটে গিয়ে পুজো এলে বাঁচি,
ছুটিটা কাটাতে যাব চুনার কি রাঁচি।
ক্লাস কেটে দিন যদি ঘুমিয়ে কাটাবে
ফেল হলে একেবারে মাথা কাটা যাবে।
হাতকাটা জামা গায়ে বাঁকা টেরি কেটে
আমাদের পাশ কেটে কে চলেছে হেঁটে ?
লোকটি সাঁতার কাটে রোজ কাটা খালে
আশা রাখে নামজাদা হবে কোনো কালে।
বলটা কাটিয়ে নিয়ে পাকা খেলোয়াড়
গোল দিয়ে এল দ্যাখো কী চমৎকার।
কত যে নক্‌শা কাটা জামা আর শাড়ি,
জল কেটে জাহাজেরা দূরে দেয় পাড়ি।
এতখন ছড়া কেটে হয়ে গেছি কাবু
এইবারে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো বাপু ॥

ছবি বিমল দাশ

ভুতুড়ে গাড়ি

আগামী সংখ্যা [illegible]কে 'গোয়েন্দা বাজ'

॥ ৬ ॥

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

আমার খেলোয়াড়-জীবনে ১০ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার আনন্দ উপভোগ করেছি। তার মধ্যে ১৯৫৪ থেকে ৫৬ পর পর তিন বছর এবং ১৯৬২ থেকে ৬৫ টানা চার বছর। কিন্তু প্রথম বছরে, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে, মোহনবাগানের লীগ জয়ে আমার সামান্যই ভূমিকা ছিল। মাত্র পাঁচটি ম্যাচ খেলেছিলুম। ওই পাঁচটি খেলায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ মোটামুটি খুশি হলেও কিছুটা চিন্তিত ছিলেন আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

"চুনীর ওই তো লিকলিকে শরীর, ফুটবলের ধাক্কাধকল কি সহ্য করতে পারবে? ইস্টবেঙ্গল মহমেডানের ফুঁয়ে উড়ে যাবে।" এই ধরনের চাপা কথা মাঝে-মাঝেই কানে আসত আর আমার মন খারাপ হয়ে যেত। মোহনবাগান ওই বছর আই এফ এ শীল্ডও জিতেছিল। শীল্ডে কিন্তু একটি ম্যাচও খেলিনি। হয়তো অভিজ্ঞতার অভাব এবং স্বাস্থ্যের কারণেই আমাকে বেশি ম্যাচ খেলানো হয়নি। তবু শুরুর বছরে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের আমিও একজন খেলোয়াড়, এটা কি কম আনন্দের। আনন্দের আরও একটি কারণ, ক্লাবের সবার ভালবাসা পেয়েছিলাম। সকলের কাছ থেকে এমন একটা আচরণ পেতাম যে মনে হত আমাকেই বুঝি সবাই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আদর করে, দরদ মিশিয়ে কথা বলে।

দরদের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখনো প্রথম ডিভিশনে খেলিনি। মোহনবাগানের 'বি' টিমে একটা ম্যাচ খেলার সময় লাফিয়ে বল হেড করতে গিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লুম। মাথার পেছনদিকে বেশ যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। হাত দিয়ে মনে হল ভিজে-ভিজে লাগছে। চোখের সামনে হাত আনতেই দেখি, রক্তে সারা হাত লাল। আমি ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। হাইট মাপের খেলায় বা আগের কোনো ম্যাচে আমি তেমন চোট-আঘাত পাইনি। রক্ত দেখে ভীষণ ভয় হল। আমাকে কাঁদতে দেখে মাঠের মধ্যে ছুটে এলেন একজন। বললেন, "বোকা ছেলে, খেলতে গিয়ে ওরকম কত আঘাত লাগে, আবার খেলতে-খেলতেই সেরে যায়। দেখ না আমার মাথায় মুখে কত কাটা দাগ। এক্ষুনি সেরে যাবে।"

তারপর তিনি টেন্ট থেকে তুলো, আইডিন, ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসে বেশ করে মাথা বেঁধে দিলেন এবং একরকম জোর করেই আবার মাঠের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বললেন, "যা ভাল করে খেল, আর রক্ত বেরোবে না।"

ওই একজন কে জানো? সুবিখ্যাত খেলোয়াড় শৈলেন মান্না। আমাদের প্রিয় মান্নাদা। মান্নাদার সঙ্গে খেলেছি পরে। অন্তরঙ্গ হয়েছি আরও পরে। কিন্তু ক্লাবের খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁর যে দরদ ও ভালবাসা সেইদিন থেকে দেখে আসছি, এখনো তা অটুট।

মোহনবাগানে প্রথম লীগ ম্যাচ খেলার আগে জার্সি গায়ে চাপানোর ঘটনাটি যেমন মজার, তেমন মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম বাইরে খেলতে যাওয়া এবং প্রথম বিমানে চড়ার ব্যাপারও গল্প করার মত। ৫৪ সালের মরসুম শেষে মোহনবাগান খেলতে গেল দার্জিলিংয়ে। আমাকেও দলে রাখা হল। আমরা যাব দার্জিলিং মেলে। তখন সকাল সাড়ে দশটায় দার্জিলিং মেল ছাড়ত শিয়ালদা স্টেশন থেকে। ঠিক ছিল বাড়ি থেকেই সোজা স্টেশনে যাব। বেলা ৯টা নাগাদ ছোট ভাই বেণুকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনতে বললুম। আমি তৈরি হয়ে বসে আছি। ট্যাক্সি আর আসে না। ক্রমেই উৎকণ্ঠা বাড়ছে। ট্যাক্সি যখন এল তখন ১০টা বেজে গেছে। আমি বকাবকি করতে বেণু কেঁদে ফেলল। বলল, "ট্যাক্সি পাচ্ছিলুম না, আমি কী করব?" বুঝলুম ওর দোষ নেই। অফিসের সময় ট্যাক্সি পাওয়া সত্যিই শক্ত। আমার আরও আগে রওনা হওয়া উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠলুম। কী দুর্দৈব, মাঝ পথে একবার গাড়ি বিকল হল। স্টেশনে পৌঁছে শুনলুম মিনিট দুই আগে দার্জিলিং মেল ছেড়ে গেছে। আমার তখনকার মনের অবস্থা তোমরা কল্পনা করে নিতে পারবে। মোহনবাগানের সঙ্গে বাইরে খেলতে যাবার প্রথম সুযোগটা এই-ভাবে হাতছাড়া হওয়ায় ভাঙা মন নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

বিকেলে ক্লাবে যেতেই বলাইদা আমাকে দেখে হইহই করে উঠলেন। সব কথা শোনার পর অবশ্য তাঁর রাগ পড়ে গেল। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন ধীরেনদার কাছে, যাতে আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ধীরেন দে তখন ক্লাবের ক্ষমতায় আসছেন। সব শুনে তিনি তো রেগে আগুন। বললেন, "মেয়ে নাকি? কলেজে পড়ছে। ট্রেন ফেল করল! আমি কিছু করতে পারব না।" কাঁচুমাচু মুখে পাশে দাঁড়িয়ে ধীরেনদার কথা শুনে ভাবলুম, ক্লাবে না এলেই ভাল হত।

আমার দার্জিলিং যাবার ব্যবস্থা কিন্তু ধীরেনদাই করে দিয়েছিলেন। তখন জানতুম না, পরে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে মিশতে জেনেছি, কথাবার্তায় ওই আপাতরুক্ষতা ধীরেনদার চরিত্রের খোলস। আসল চরিত্র নয়। মানুষটির মন খুবই নরম। খেলোয়াড়দের প্রতি অসাধারণ স্নেহ-ভালবাসা। তাদের জন্য কিছু করতে সদা উন্মুখ। কিন্তু প্রথমে নিজেকে কাঠিন্যের আবরণে ঢেকে রাখতে চান। সেই কঠিনতার আড়ালে কী স্নেহ রয়েছে, সেটা ধীরে ধীরে জানা যায়।

দার্জিলিং গিয়েছিলুম কীভাবে? ঠিক ছিল বদরু ব্যানার্জী আর সত্তার যাবে পরের দিনের প্লেনে। সত্তারের আর যাওয়া হল না। তার টিকিটে আমি প্লেনে চেপে বসলুম। মনে মনে ধন্যবাদ জানালুম বেণুকে। সে দেরিতে ট্যাক্সি এনেছিল বলেই তো আমার

চুনী। মোহনবাগানে তখন তিনি সদ্য এসেছেন।

প্রথম এরোপ্লেনে চড়া হল।

ফুটবল মরসুমের শেষে ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে আই এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তার সঙ্গেই চলছিল ক্রিকেট খেলা। আন্তঃ কলেজ ক্রিকেটের ফাইনালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিরুদ্ধে নিখুঁত একটি সেঞ্চুরি করে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় দলে ঢুকে গেলুম। খেলা ছিল পাটনায় আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রিকেট অর্থাৎ রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফির খেলা।

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ, প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম দিকে আমি কত বাধা পেয়েছি। প্রথম ক্রিকেট সফরেও বাধা এল। অন্য বাধা-গুলি তবু পার হতে পেরেছিলুম। এবার পাটনায় পৌঁছেও কিন্তু খেলতে পারলুম না।

হঠাৎই পাটনা যেতে হয়েছিল বলে বাবার অনুমতি নিতে পারিনি। তাছাড়া একটু দুষ্টবুদ্ধিও মাথায় ভর করেছিল। সামনেই পরীক্ষা। বাবা যদি রাজি না হন, তবে আমার পাটনায় যাওয়া হবে না। তাই মাকে বলে গিয়েছিলুম। বাবা তখন ছিলেন অফিসে।

খেলোয়াড় বন্ধুদের সঙ্গে পাটনায় একদিন হেসেখেলেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন নেট প্র্যাকটিস সেরে হোটেলে পৌঁছে দেখি, দাদা আমার ঘরে গোমড়া মুখ করে বসে আছেন। মুখে টু শব্দটি নেই। কিছু একটা ঘটেছে ধরে নিয়ে আমি বললুম, "কী ব্যাপার, কারো অসুখ-বিসুখ করেনি তো?" দাদা কথার মধ্যে বেশ একটু রহস্য মিশিয়ে বললেন, "বাড়িসুদ্ধ সকলেরই অসুখ।" "কী অসুখ? কবে হল?" এবার দাদা আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমাকে আজই আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। বাবা বলে দিয়েছেন, আগে পরীক্ষা, তারপরে খেলা এবং অন্য সবকিছু। তুমি তৈরি হয়ে নাও।"

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। পরীক্ষার চিন্তাটা দূরে সরিয়ে রেখে বেশ হাল্কা মনে পাটনায় কাটাচ্ছিলুম। তারপর খেলা তো ছিলই। কলকাতায় ফিরে আসতে কিছুতেই মন চাইছিল না। বললুম, "আমি যাব কী করে? আমরা তো রেলওয়েজ কনসেশনে এসেছি। পুরো দলের টিকিট তো একসঙ্গেই কাটা হয়েছে।" দাদা ফট করে পকেট থেকে রেলের পাস বের করে বললেন, "বাবা সে-ব্যবস্থা আগে থেকেই করে দিয়েছেন। তোমাকে ফিরে যেতেই হবে।"

আমার আর কোন উপায় ছিল না। নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙলে বাবা ভীষণ রেগে যেতেন। তাই না-খেলেই পাটনা থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

মোহনবাগানেই থাকব, না অন্য কোন ক্লাবে যাব—এই প্রশ্নে পরের বছর আমি পড়লুম মহা সমস্যায়। আমি ১৯৫৫ মরসুমের কথা বলছি। নিজে কোনদিনই মোহনবাগান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইনি। কিন্তু দলবদলের মুখে অনেকেই কানে-কানে বলতে আরম্ভ করল, মোহনবাগান তোকে নিয়মিত খেলাবে না। সত্তার আর বদরু ব্যানার্জী তো দুই ইনে খেলবেই। তাছাড়া রাজস্থান ক্লাব থেকে পুষ্পরাজও আসছে মোহনবাগানে। পুষ্পরাজ তখন নামকরা ইনম্যান। বন্ধুবান্ধবরা পরামর্শ দিল এক বছর ছোট ক্লাবে খেললে ভালই হবে। তারপর বড় ক্লাব আদর করে টেনে নেবে। বলাইদার শ্যেন দৃষ্টি ছিল। দুই একটি ক্লাবের কর্ম-কর্তাদের আমার পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখে বলে দিলেন, "চুনী কোনদিনই মোহনবাগান ক্লাব ছেড়ে যাবে না। এই ক্লাবে খেলেই ও নাম করবে।" আজ বলতে বাধা নেই, দলবদলের প্রশ্নে আমার মনে যেটুকু দোলা লেগেছিল, বলাইদার কথায় কেটে গেল। আমার দাদা তখন খেলতেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে। তিনিও আমাকে আগলে রাখতেন, যাতে আমাকে কেউ প্রলুব্ধ করতে না পারে।

প্রলোভন কিন্তু পরে প্রায় প্রতি বছরই এসেছে। মোহন-বাগানের লৌহকপাট ভেঙে আমাকে বের করে নেবার চেষ্টা হয়েছে। এমন কী, এসেছে মোটরগাড়ি উপহার পাবার টোপও। কিন্তু আমার মন টলেনি। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৬ সালের একটি ঘটনার কথা বলছি।

জ্যোতিষদা এলেন আমাদের বাড়িতে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গৌরব অধ্যায় রচনার রূপকার জ্যোতিষ গুহ। তখন ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি। বলাইদার মতই বিরাট পুরুষ। বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যেন ময়দানের এক সচল বনস্পতি। বাবা জ্যোতিষদাকে আদর করে খাওয়ালেন এবং বললেন, "চুনী কোন্ ক্লাবে খেলবে তা চুনী-মানিকই জানে, আর জানেন বলাইবাবু। ওসব ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।"

জ্যোতিষদা আমার দুর্বল স্থানটিতে নাড়া দিলেন। "চুনী, নিশ্চয়ই মনে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ?"

"কেন?"

"এই যে মেলবোর্ন অলিম্পিকের জন্য ভারতের দল গড়া হল, কই, তোমার হয়ে তো তোমার ক্লাব কিছু করল না। আমি মনে করি দলে তোমার স্থান পাওয়া উচিত ছিল।"

কবুল করছি, জ্যোতিষদার মত মানুষের কথা শুনে প্রথমে একটু বিচলিত হয়েছিলুম। কিন্তু দুর্বলতা কাটিয়ে বললুম, "যাঁরা দল গড়েছেন তাঁরা হয়তো আমাকে যোগ্য বিবেচনা করেন-নি। ক্লাব কী করবে? ক্লাব তো আমাকে নিয়মিত খেলাচ্ছে। আমার কোন দুঃখ নেই। তাছাড়া ঠিক করেছি, কোনদিনই মোহনবাগান ক্লাব ছাড়ব না।"

জ্যোতিষদা একটু হেসে বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ। কলকাতা ময়দানের হালচাল কিছুই জান না। সবুজ-মেরুন জার্সি ছাড়া কোনদিন অন্য রংয়ের জার্সি পরবে না, এই সংকল্পে যদি

দার্জিলিংয়ে মোহনবাগান (১৯৫৫)। বাঁ-দিক থেকে চতুর্থজন চুনী।

অটল থাকো, আমি তোমাকে আর অনুরোধ করব না। কিন্তু সংকল্পে অটুট থাকা খুবই শক্ত চুনী। জানি না তুমি সেটা বজায় রাখতে পারবে কিনা। যদি পারো, আমি বলছি এবং আশীর্বাদ করছি, তুমি অনেক বড় হবে, জীবনে অনেক উন্নতি করবে।"

কথাগুলি বলার সময় জ্যোতিষ গুহর চোখেমুখে যে ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছিল, তখন বয়স কম হলেও সেটা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। জ্যোতিষদা আর কোনদিনই আমাকে ইস্টবেঙ্গলে টানার চেষ্টা করেননি। বরং শুনেছি আর-কেউ চেষ্টা করলে তাকে বাধা দিয়েছেন। এবং আমাদের পরিবারের সঙ্গে চিরদিন এমন মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন যেন আমি তাঁর ক্লাবেই খেলছি। ছোটখাটো অনেক ব্যাপারেই তাঁর উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি। মানুষের বড় হবার পেছনে অনেক গুণ থাকে। জ্যোতিষ গুহও ক্রীড়াজগতের বিশেষ ব্যক্তি এবং অসাধারণ ক্লাব-প্রশাসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন নানা গুণের সমন্বয়ে।

আবার ১৯৫৫ মরসুমে ফিরে আসি। পুষ্পরাজ মোহন-বাগানে এল না। সুতরাং আমি হলাম তৃতীয় ইনম্যান। প্রায় সব ম্যাচেই খেলেছি, শুধু চ্যারিটি ম্যাচগুলি ছাড়া। যেদিন সত্তার লেফ্‌ট ইনে খেলতেন, আমি খেলতাম রাইট ইনে। বদরু খেললে লেফ্‌ট ইনে। দুজনে যেদিন খেলতেন, আমি বাদ পড়তুম। সে মরসুমে আমার পরিচিতি আরও বাড়ল বড় মহলে। মোহনবাগান আবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। কিন্তু শীল্ড সেমিফাইনালে হেরে গেল এরিয়ানের কাছে ১—২ গোলে।

হারের অবশ্য কারণও ছিল। অনেক খেলোয়াড়ই অসুস্থ ছিল চোট-আঘাতে। সুতরাং মোহনবাগান ঠিক করল রোভার্সে খেলতে যাবে না। মান্নাদার অ্যাংকল মুচড়ে গিয়েছিল। কেষ্ট দত্তর হাঁটু ফুলে ছিল। হাত-পায়ের হাড়ে চোট ছিল আরও দু-একজন খেলোয়াড়ের। এই অবস্থায় রোভার্সে খেলতে যাবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন সুশীল গুহ। কর্মকর্তাদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, মোহনবাগান তো কোনবার রোভার্স কাপ পায়নি। যদি এবারও না পায় ক্ষতি কী? চেষ্টা করে দেখাই যাক্ না। কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত রাজি হলেন। তখন অন্য ক্লাব থেকে খেলোয়াড় নিয়ে রোভার্স-ডুরান্ড খেলা যেত। আমরা কয়েকজন খেলোয়াড় হায়ার করে বোম্বাই যাত্রা করলুম। আমার প্রথম বোম্বাই যাত্রা এবং রোভার্সে প্রথম খেলা। (ক্রমশ)

আন্তঃকলেজ ক্রিকেট ফাইনালে আশুতোষ কলেজ দল। সামনে, বাঁ-দিক থেকে চতুর্থজন চুনী।

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

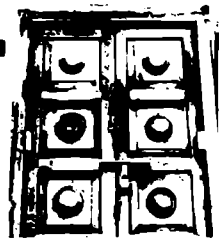

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গতকাল গোগোল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে শুনেছিল, ওদের আটতলা বাড়ির আটতলারই এক ফ্ল্যাটের ডাবুদা হারিয়ে গিয়েছে। ডাবু গোগোলের থেকে বড়, ক্লাস এইটে পড়ে। গোগোল শুনেছিল, ডাবুদা নাকি আগের দিন খেয়ে ইস্কুল গিয়েছিল, আর বাড়ি ফেরেনি। ইস্কুল থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে, সে সেখানেও যায়নি। গোগোল ওদের পাঁচতলার ফ্ল্যাট থেকে আটতলায় ডাবুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে, ওদের বাড়ির অন্য বাসিন্দা হনুমন্তিয়াজীর মুখ থেকে শুনে এসেছিল, ডাবুদাকে হয়তো ডাকাতেরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবার অনেক টাকা মুক্তিপণ দাবি করবে। গোগোল তৎক্ষণাৎ ওর বন্ধু সুমিত, জর্জ, গোগে, টুকাই আর পারভেজকে খবরটা দেবার জন্য নীচে ছুটে গিয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময়, সাততলার মহেশানিদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভিতরে ও মানুষের চাপা গলার স্বর, আরও দু-একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছিল। অথচ ও জানত মহেশানিদের সকলেই বিশেষ কারণে দিল্লি চলে গিয়েছেন, ফ্ল্যাটে থাকবার কথা কেবল তাঁদের কাজের লোক চান্দা সিংয়ের। এছাড়া আর একটা অচেনা লোককে ও গোটা বাড়িতে কখনো লিফটে কখনো সিঁড়িতে ওঠানামা ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। লোকটার ভাবভঙ্গি ওঁর মোটেই ভাল লাগেনি। পরে বেশ সন্দেহজনক মনে হয়েছিল, যখন জানতে পেরেছিল, লোকটা নাকি চান্দা সিংয়ের মামা, অথচ দু ঘণ্টা ধরে মহেশানিদের ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ঝাড়ির মধ্যে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বের করতে দু ঘণ্টা লাগে? তা ছাড়া মহেশানিদের বন্ধ-দরজা ফ্ল্যাটের শব্দ গোগোলের মনে খটকা লাগায় ও কয়েকবার ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি মেরে দেখেছে। আবার শব্দ শুনতে পেয়েছে, আর ভিতরে ঝাপসা আলোও দেখতে পেয়েছে। অথচ চান্দা সিংয়ের মামা বারে বারে দরজায় ধাক্কা মেরেও ভিতর থেকে কারো সাড়া পায়নি। আজ সকালে ইস্কুলে যাবার আগেই, হনুমন্তিয়াজীর কাছ থেকে জানা গেল, গতকাল অনেক রাত্রে একজন ডাকাত ডাবুদার বাবাকে টেলিফোন করে জানিয়েছে, ডাবুদাকে তারা আটকে রেখেছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে ছেড়ে দেবে। একথা শোনার পর থেকেই গোগোলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভীষণ উত্তেজনা ওর ভিতরে। ইস্কুলে ভাল করে ক্লাস করতেও পারেনি। ও আজ বাড়ি এসেই, জলখাবার খেয়ে অনেক ভেবে চিন্তে মহেশানিদের বন্ধ-দরজা ফ্ল্যাটের ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়েছিল। দেখেছিল ভিতরের পর্দাটা সরানো, আবছা আলোয় ডাবুদা ভিতরে বসে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে! দেখেই ওর চুল খাড়া! এও কি সম্ভব? ও নীচে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বন্ধুদের বলতে পারেনি। ভিতরে ডাবুদাই ছিল কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য ও আবার মহেশানিদের লকের ছিদ্রে উঁকি মারতে গিয়েছিল, আর তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে মোটা পর্দাটাই যেন হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে জাপটে ওকে ভিতরে টেনে নিয়েছিল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর—

১০

গোগোলের মনে হল, ওর চোখে গভীর ঘুম। কিছুতেই চোখ মেলতে পারছে না। চোখের পাতাগুলো যেন সীসের মতো ভারী। অথচ ও শুয়ে আছে, না বসে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। ও যে কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছে, তাও বুঝে উঠতে পারছে না। কেবল বুঝতে পারছে, ওর শরীরটা যেন একটু-একটু দুলছে। এক-একবার মনে হচ্ছে, ওর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, এবার চোখ মেলে তাকাবে। তারপরেই আবার যেন দু চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসছে। চোখ মেলে তাকানো তো দূরের কথা, কিছু ভাবতেই পারছে না। গভীর ঘুমে ডুবে যাচ্ছে।

স্বপ্নে অনেক সময় এরকম হয়। যদিও গোগোল এখন সে-কথা মনে করতে পারছে না, কিন্তু মায়ের পাশে শুয়ে, স্বপ্নেও ওর অনেক দিন এরকম হয়েছে। যেন ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে, চোখ মেলে তাকাবে, কথা বলবে, অথচ কিছুই করতে পারছে না। অনেকটা ঢেউয়ের বুকে ওঠা, আবার নেমে যাওয়ার মতো। এই বুঝি ঘুম ভেঙে যাবে, চোখ মেলে তাকাবে। তারপরেই হঠাৎ আবার কোথায় তলিয়ে গেল। এরকম ঘটনা যখন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে, তখন অবস্থাটা বেশ কষ্টকর মনে হয়। পাশে শুয়ে থাকলে, মা-ই একমাত্র বুঝতে পারেন, আর বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে গোগোলের ঘুম ভাঙিয়ে দেন। গোগোলের কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। ও ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা, আমার কী হয়েছিল?"

মা হেসে বলেন, "কী আবার? নিশ্চয়ই কোন স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলি, আর গোঁগোঁ করছিলি। এ সময়ে মানুষকে জাগিয়ে না দিলে, ঘুমন্ত অবস্থায় ভারী কষ্ট হয়।"

গোগোলের অবিশ্যি পরে অনেক কিছুই মনে পড়ে যায়। অদ্ভুত আর বিচিত্র সব ঘটনা। সবই আবোল-তাবোল স্বপ্নের ঘটনা। কী করে যে ও-ধরনের সব স্বপ্ন ঘুমন্ত ওর মাথায় ঢুকে পড়ে, কিছুই বুঝতে পারে না। যেন কোন জাদুকর ওকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন যে কী করে মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ে, ও কিছুই বুঝতে পারে না। ও মায়ের কাছে আর একটা কথা শুনেছে, ঘুমন্ত মানুষকে বোবায় পাওয়ার কথা। সেটাও একরকমের স্বপ্ন। মনে হয়, অনেক কথা মুখ ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অথচ একটা কথাও মুখ দিয়ে বের হয় না। সেটাও এক ধরনের কষ্টের স্বপ্ন। গোগোলের সেরকম অবস্থাও হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে ভয়ে বা রাগে বা আনন্দে ও অনেক কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। নেহাত মা পাশে থেকে তাড়াতাড়ি গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেন, তাই রক্ষে। গোগোলের মনে হয়, তা না হলে হয়তো ও দম বন্ধ হয়ে মরেই যেত।

এখনো গোগোলের সেরকম একটা কষ্ট হচ্ছে। গাঢ় ঘুমের থেকে যেন ও এক-একবার জেগে উঠছে। শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগছে। যেন ও একটা দোলনায় দুলছে। অথচ চোখ মেলতে পারছে না। ঘুমটা যেন ভেঙেও ভাঙতে চাইছে না। কিছু ভাবতে গিয়ে ভাবতে পারছে না। কোথায় আছে, কী করছে, কিছু বুঝতেও পারছে না।

এরকম অবস্থা বেশ কতক্ষণ ধরে চলল, গোগোল তার কোন হিসাব করতে পারে না। এক সময়ে একটা বড় ঝাঁকুনি লাগতেই মনে হল, ওর ঘুমটা একেবারে ভেঙে গেল। আর ও একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপরেই ও আবার গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যেতে লাগল। অথচ একেবারে তলিয়ে গেল না। ওর গাটা কেমন কেঁপে উঠল। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মহেশানিদের ফ্ল্যাটের দরজাটা ঝপ করে খুলে গেল, আর মোটা পর্দাটাই যেন হাত বাড়িয়ে ওকে ভিতরে টেনে নিল

গোগোল এই পর্যন্ত ভাবতেই আবার ওর ঘুম পেতে লাগল। কিন্তু ঘুমের ঘোরের মধ্যেই. সেই আশ্চর্য আর ভয়ংকর বিভীষিকা-ময় ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। প্রথমেই ওর মনে পড়ল, মহেশানিদের বন্ধ দরজাটা খুলে যাওয়া, আর মোটা পর্দাটার দুটো ভুতুড়ে হাত হয়ে ওঠা! আসলে মোটা পর্দাটা মোটেই হাত হয়ে ওঠেনি। পর্দার আড়ালেই হাত দুটো লুকিয়ে ছিল। আর অন্য একজন ওত পেতে ছিল. গোগোল আবার ইয়েল লকের ছিদ্র উঁকি দিতে এলেই দরজাটা খুলে দেবে।

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক সেই রকমই। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পরেই গোগোল চিৎকার করতে যাচ্ছিল। তখনই ওর মুখের ওপর একটা মোটা থাবা চেপে বসেছিল। এখন ওর ঘুমঘোরের মধ্যেও পরিষ্কার মনে পড়ছে. সেই মোটা থাবায় সিগারেটের গন্ধ ছিল। গোগোল হাত পা ছোঁড়বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একটা মোটা চওড়া হাত. ওর দুটো হাত পিছন দিকে টেনে নিয়ে, পিছমোড়া করে চেপে ধরেছিল। ভীষণ শক্ত আর বড় হাত, এত জোরে চেপে ধরেছিল. গোগোলের রীতিমত ব্যথা লাগছিল। ও মুখ দিয়ে যন্ত্রণার শব্দ করতে চাইলেও, একটু শব্দও করতে পারেনি। বরং ও পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল বলে, ওর মুখ আর হাত চেপে ধরে-রাখা শক্ত হাত দুটো ওকে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, যেন তখনই আছাড় দিয়ে মেরে ফেলবে। ও কেবল মোটা চাপা স্বর শুনতে পেয়েছিল "উস্‌কো অন্দর মে লে চলো।"

গোগোল তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। ওর চোখের সামনে সব একদম অন্ধকার। ও আশা করেছিল, ডাবুদাকে দেখতে পাবে। তার বদলে. দুটো শক্ত হাত ওর মুখ আর হাতে চেপে ধরে ঠিক একটা বেড়াল-বাচ্ছার মতো শূন্যে তুলে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কেউ পিছমোড়া করে ওর হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল। তারপরেই মুখের ওপর কয়েক পাল্লা মোটা একটা কাপড় বেঁধে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অবিশ্যি একটা নরম কিছুর ওপরেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেটা যে একটা মোটা ডানলোপিলোর গদি, গোগোল তা বুঝতে পেরেছিল। একজন কেউ ওর গায়ের কাছে চেপে বসেছিল, তার একটা মোটা ঠ্যাং সে গোগোলের হাঁটুর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। আর একজন মোটা-শেডে-ঢাকা একটা লাইট জেবলে দিয়েছিল। মোটা শেডের জন্যই আলোটা ছিল বেশ কম। ঠিক যেন ঘরের ভিতরে ভোরের আবছা আলোর মতো।

গোগোল ভয়ে আর আতঙ্কে এমনই হয়ে গিয়েছিল, সেই আবছা আলোয় দুটো ঝাপসা মূর্তি ছাড়া প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। ও তখন দরদর করে ঘামছিল, আর বুকে এত জোরে জোরে শব্দ হচ্ছিল, যেন গোটা ঘরের মধ্যে তা শোনা যাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই গোগোল স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বড় খাটের বিছানায় যে লোকটা তার গায়ের ওপর ঠ্যাং চাপিয়ে বসে আছে, সে আর কেউ নয়, চান্দা সিংয়ের সেই মামা! আর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং চান্দা সিং! গোগোলের চোখে, তাদের দুজনকেই ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। তারা দুজনেও ঘামছিল, আর তাদের মাথার চুলগুলো উস্‌কো-খুসকো দেখাচ্ছিল। কিন্তু ডাবুদার কোনো চিহ্নই ছিল না।

চান্দা সিং তার গোঁফের নীচে, ওপরে, মাড়ির দাঁত দিয়ে এমন ভাবে নীচের ঠোঁট চেপে ধরেছিল, তাকে ঠিক দুর্গা প্রতিমার মহিষাসুরের মতো দেখাচ্ছিল। তার গুলিভাঁটা শক্ত চওড়া শরীরে কোন জামাও ছিল না। তার চোখ দুটো যেন কেমন লাল দেখাচ্ছিল, অনেকটা মোষের মতোই। গোগোলের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "গোগোল, তুমি খুব ওস্তাদ বনে গেছ, না?"

গোগোল কোনো জবাবই দিতে পারেনি। জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। ওর মুখ তো বাঁধা ছিলই। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গিয়েছিল, ও তখনো ঠিক কিছু

ভাবতেই পারছিল না। যে চান্দা সিং আগে দেখা হলে, হেসে কথা বলত, সে যেন সেই চান্দা সিং নয়। যেন অন্য চান্দা সিং, সে বেশ ভাল বাঙলা বলতে পারে, বাঙলাতেই কথা বলেছিল।

চান্দা সিংয়ের পরেই তার মামা আগের মতোই ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় বলে উঠেছিল, "বাচ্ছা ছোকরা আপনেকো বহুত বড়া জাশুশ ভেবে লিয়েছে।" বলেই মারবার জন্য হাত তুলে গর্জন করে বলেছিল, "এক ঝাম্পড়ে তোমার বদন বিগড়ে দেব।" কিন্তু সে গোগোলকে মারেনি।

চান্দা সিং দু হাতে, মাংসের দোকানের কসাইয়ের মতো, ছুরি শানাবার ভঙ্গি করে নিজের গলায় বুলিয়ে বলেছিল, "বেশি চালাকি করলে, তোমাকে একেবারে দুনিয়া থেকে গুম করে দেব।"

গোগোলের বুকের মধ্যে কেবল ধক ধক করছিল কিছুই বলতে পারছিল না। কী যে ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিল না কিছুই। চান্দা সিং আর তার মামার মুখের দিকে শুধু দেখছিল। কিন্তু চান্দা সিং যে ওকে গলায় ছুরি মারার কথা বলেছিল এটা বুঝতে পেরে ওর শিরদাড়াটা কেঁপে উঠেছিল। তবু চান্দা সিংয়ের মামাকে ওর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছিল, 'জাশুশ' শব্দের মানে কী? মুখ বাঁধা থাকার জন্যই জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

চান্দা সিং আবার চোখ পাকিয়ে বলেছিল, "তুমি মনে করেছ, ভিতর থেকে আমি কিছুই দেখিনি? কাল থেকে তুমি খালি দরজার চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখছিলে। কেন দেখছিলে? তুমি কি চোর না ডাকাত, পরের দরজায় উঁকি দাও?"

চান্দা সিংয়ের মুখে 'চোর ডাকাত' শুনে, গোগোলের বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল। মুখ বাঁধা না থাকলে বলেই দিত, বন্ধ দরজার ভিতরে ও নানারকম শব্দ শুনেছে বলেই উঁকি দিয়েছিল। তারপরেই ওর মনে পড়ে গিয়েছিল ওরকম কিছু বলাটা মোটেই ঠিক হবে না। তা হলে, ওর যে একটা ধারণা হয়েছিল, একটু আগেই ও চাবির ছিদ্র দিয়ে ডাবুদার মতো একজনকে দেখতে পেয়েছে, সে-কথা বলে দিতে হত। তা ছাড়া, চান্দা সিং যদি ভাল লোকই হবে, তবে সে আর তার মামা কেন ওরকম ভাবে গোগোলকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে হাত আর মুখ বেঁধে দিয়েছিল?

চান্দা সিংয়ের মামা তাকে বলেছিল, "আরে হাম তো আপনা আঁখ মে দেখেছি, এ লেড়কা দফায়-দফায় এ দরোয়াজার অন্দরমে দেখছিল। ইসকো তো হামি হরটাইম নজর রেখেছি।"

চান্দা সিং তার মামার কথা শুনেই, চোখ টিপে ইশারা করেছিল। আর মামা লোকটাও চট্ করে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলেছিল, "না না, ইস্‌কো উপর নজর মানে, হামি এই কোঠিটা খোঁজ করছিলাম।"

গোগোল বুঝতে পেরেছিল মামা লোকটা মিথ্যা কথা বলছে। সে আগের কথাটাই ঠিক বলেছিল, যে সে গোগোলের ওপর নজর রাখছিল। সত্যি কথা ফাঁস হয়ে যাবার জন্যেই চান্দা সিং তার মামাকে চোখের ইশারা করেছিল। বলেছিল, "কিন্তু এখন এই ছেলেটার কাছ থেকে কথা আদায় না করতে পারলে তো হবে না। আমাদের জানতে হবে, ও কেন বারে বারে চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখছিল।"

চান্দা সিং আর তার মামা এমনভাবে নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলছিল, যেন সব সময়েই তারা নিজেদের মধ্যে ইশারা করছিল। মামা বলেছিল, "কথা আদায় করবে তো লেড়কার মুখের কাপড়া খুলে দিতে হবে, তো ইস্‌কে বাদ ও যদি চিল্লাচিল্লি করে?"

একমাত্র গাছগাছড়ার ভেষজগুণ দাঁতকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে

এক মাত্র নিম

টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের যাবতীয় ভেষজ ও ঔষধীয় গুণ

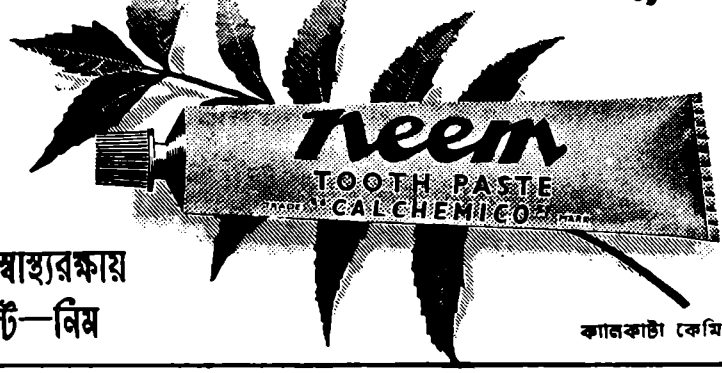

IDL/NTN/4B

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এর তৈরি

চান্দা সিং মুখটা শক্ত করে বলেছিল, "চিল্লাচিল্লি করলেই হল? দরজা-জানালা বিলকুল সব বন্ধ আছে। চিল্লাচিল্লি করলেও বাইরে থেকে কেউ শুনতে পাবে না। আর যদি চিল্লাচিল্লি করেই, তা হলে একদম মুরগা জবাই হয়ে যাবে।"

'মুরগা জবাই' কথাটা গোগোল ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, আর সে-কথা শুনেই, চান্দা সিং যে কী চরিত্রের লোক, তাও বুঝতে পেরেছিল। মানুষকে যারা মোরগের মতো জবাই করার কথা বলে, তারা কখনোই ভাল লোক হতে পারে না। গোগোল যতই তাদের কথা শুনছিল, ততই মনে হচ্ছিল, চান্দা সিং আর তার মামা মোটেই সহজ লোক নয়। তাদের নিশ্চয়ই কোন খারাপ মতলব আছে। অথচ ওর এই বয়সের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটলেও, এরকম বিপদে ও আর কখনো পড়েনি। ও ভিতরে-ভিতরে ভয় পাচ্ছিল, আবার মনের মধ্যে অনেক কৌতূহলও হচ্ছিল। আর এটাও ও বুঝতে পেরেছিল, চিৎকার চেঁচামেচি করে কিছু হবে না। বাইরে থেকে কেউ শুনতে তো পাবেই না, চান্দা সিং হয়তো সত্যি কিছু করে ফেলতেও পারে।

চান্দা সিংয়ের মামা বলেছিল, "লেড়কাকে পুছিয়ে দেখ, মুখের কাপড়া খুলে দিলে, ও চিল্লাচিল্লি না করে, জবাব বাতাবে কি না?"

চান্দা সিং বলেছিল, "কী গোগোল, যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব দেবে তো? কোনরকম বেয়াদপি করবে না তো?"

গোগোল প্রথমটা কিছুই বলতে পারেনি। পরে ভেবেছিল, কথা বলাই ভাল। কারণ, ডাবুদা ভিতরে ছিল কি না, ও ঠিক দেখেছে কি না, সেটা তা নইলে জানা যাবে না। আসলে তখন ডাবুদার কথা ছাড়া, আর কিছুই ওর জানবার ছিল না। ও মাথা নেড়ে ইশারা করেছিল, কোনরকম গোলমাল করবে না। চান্দা সিং নিজেই এগিয়ে এসে, গোগোলের মুখে বাঁধা কাপড়টা খুলে দিয়েছিল। এত জোরে কাপড় বেঁধেছিল, গোগোলের দুটো গালে লাল দাগ হয়ে গিয়েছিল। ও দু হাত দিয়ে গাল ঘষছিল। কিন্তু চান্দা সিংয়ের মামা তার ঠ্যাং গোগোলের হাঁটুর ওপর থেকে সরায়নি। আবছা আলোর মধ্যেও গোগোল তখন স্পষ্ট সবই দেখতে পাচ্ছিল। ঘরটা যে মহেশানিদের ভিতরের দিকে একটা শোবার ঘর, তা বুঝতে পেরেছিল।

গোগোলের মুখের কাপড় খুলে দিয়ে, চান্দা সিং তার আর-এক পাশে বসে জিজ্ঞেস করেছিল, "এবার ভাল ছেলের মতো বলো তো, তুমি কেন বারে বারে দরজার চাবির ফুটোয় উঁকি মারছিলে?"

গোগোল চান্দা সিং আর তার মামার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। পালাবার কোন উপায়ই ছিল না। তবুও সামনের ঘরের খোলা দরজার দিকে একবার তাকিয়েছিল। তারপরে বলেছিল, "আমি ভেতর থেকে আওয়াজ পেয়েছিলাম।"

চান্দা সিং আর তার মামা চোখে চোখে তাকিয়েছিল। চান্দা সিং অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "আওয়াজ? কিসের আওয়াজ?"

গোগোল বলেছিল, "মনে হয়েছিল, কেউ যেন চুপিচুপি কথা বলছিল, আর কী একটা ধুপ্ করে পড়ে গেছল!"

চান্দা সিং বলেছিল, "তাতে তোমার কী? কারোর বাড়ির ভেতরে আওয়াজ হলে, সেখানে উঁকি মারতে হবে?"

গোগোল বলেছিল, "আমি তখন ভেবেছিলাম, এ ফ্ল্যাটে কেউ নেই, সবাই দিল্লি চলে গেছে। মনে করেছিলাম, চোর ঢুকেছে।"

চান্দা সিং মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "কেউ থাকবে না কেন? আমি তো ছিলাম। তোমার যখন চোরের কথা মনে হল, তুমি কলিং বেল বাজালে না কেন? তা হলেই আমি দরজা খুলে দিতাম। তুমি চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলে কেন?"

গোগোলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, "বেলের সুইচ্ টিপেছিলাম, বাজেনি।"

গোগোলের কথা শুনে, চান্দা সিং আর তার মামা চোখা-চোখি করেছিল। যেন তারা চোখে-চোখে কিছু ইশারা করেছিল। চান্দা সিং বলেছিল, "সে তো বাড়ির মালিকরা কেউ নেই বলে আমি কলিংবেলের সুইচ্ অফ করে রেখেছিলাম। তুমি দরজায় ধাক্কা দিলে না কেন? চোরের মতো উঁকি দিচ্ছিলে কেন?"

গোগোল ঝেঁজে প্রতিবাদ করেছিল, "আমি চোর নই।"

চান্দা সিংও ধমকে বলেছিল, "তবে ওরকম উঁকি মারছিলে কেন? এখন যদি তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাই তা হলে কেমন হবে? তাঁরা তোমাকে ভাল বলবেন?"

গোগোল তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিল, "বাবা-মার কাছে নিয়ে চলো। আমি সত্যি কথাই বলব।"

চান্দা সিংয়ের মামার গলা দিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ বেরিয়ে-ছিল, আর গোগোল ফিরে তাকাবার আগেই সে কিছু একটা ইশারা করেছিল। চান্দা সিংও একটু মাথা নেড়েছিল, গোগোলকে আবার বলেছিল, "তুমি কি পরে বুঝতে পারোনি, আমি ভেতরে রয়েছি?"

গোগোল বলেছিল, "না, আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার মনে পড়েছিল, তুমি বাড়ির লোকের সঙ্গে দিল্লি যাওনি।"

চান্দা সিংয়ের গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ফুটেছিল, বলেছিল, "বাঃ, এই তো ভাল ছেলের মতো কথা। তোমার যখন মনেই পড়ে গেল, আমি দিল্লি যাইনি, তবে তো জানাই কথা, আমি ভেতরে রয়েছি। তবু তুমি কেন উঁকি দিয়ে দেখছিলে?"

গোগোল মাকে লুকিয়ে মাখন রুটি প্যান্টের পকেটে পুরে ফেলতে পারে। চুপচাপ থেকে অনেক কথা না বলতে পারে। কিন্তু মিথ্যা কথা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। চান্দা সিংয়ের কথার জবাবও ওর মুখে হঠাৎ আসেনি, চুপ করে ছিল। চান্দা সিং বেশ তাড়া দিয়ে বলেছিল, "বলো, বলো, কেন তুমি বারে-বারে আমাদের চাবির ফুটোয় উঁকি দিয়ে দেখছিলে?"

গোগোল কথা ভাঙতে চায়নি। বলেছিল, "বললাম তো, আমি ভেবেছিলাম, ফ্ল্যাটের মধ্যে বোধহয় চোর ঢুকেছে।"

চান্দা সিং আবার ধমকানো স্বরে বলেছিল, "সে তো আগের কথা, যখন তোমার মনে ছিল না, আমি বাড়ির মধ্যে আছি। তারপরেও তুমি আবার কেন উঁকি দিয়েছিলে?"

চান্দা সিংয়ের মামা বলে উঠেছিল, "আজ ভি তো থোড়া আগে তুমি ফির উঁকি দিচ্ছিলে।"

গোগোল অবাক চোখে চান্দা সিংয়ের মামার দিকে তাকিয়ে-ছিল। একটু আগেই যে উঁকি দিয়েছিল, এ লোকটা তা জানল কী করে? দেখলই বা কোথা থেকে? চান্দা সিং বিরক্ত স্বরে বলে উঠেছিল, "আঃ জৈল সিং, তুমি কী সব আজে বাজে বাত করছ?"

জৈল সিং! লোকটা কি তা হলে চান্দা সিংয়ের মামা নয়? মামাকে কি কেউ নাম ধরে ডাকে? চান্দা সিংয়ের ধমক খেয়ে জৈল সিং লোকটা কেমন একটু থতিয়ে গিয়েছিল। দুজনে চোখে-চোখে তাকিয়ে যেন কিছু একটা ইশারা করেছিল। গোগোল পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, দুটো লোকই কিছু একটা চাপবার চেষ্টা করছে। একটা কোন মতলব তাদের রয়েছে। চান্দা সিং আবার তাড়া লাগিয়েছিল, "গোগোল, জলদি বলে দাও, তুমি কেন উঁকি দিচ্ছিলে। কথাটা বললেই তোমাকে ছেড়ে দেব।"

গোগোল ছাড়া পাবার আশায় মনে-মনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

ওর মাথায় আসেনি, যারা ওরকম ভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে হাত বেঁধে, মুখে কাপড় চাপা দেয়, তারা এত সহজে ছাড়তে পারে না! ও বলে ফেলেছিল, "একটু আগে, চাবির ফুটোয় উঁকি দিয়ে আমি ডাবুদাকে ভেতরে দেখতে পেয়েছিলাম।"

চান্দা সিং আর জৈল সিং যেন চমকে উঠে, চোখে-চোখে তাকিয়েছিল। তারপরেই চান্দা সিং হো হো করে হেসে উঠেছিল। তাকে হাসতে দেখে জৈল সিংও হেসে উঠেছিল। এতই হাসছিল, যেন এমন হাসির কথা তারা আর কখনো শোনেনি। চান্দা সিং হাসতে হাসতেই বলেছিল, "ডাবুদা? এই বাড়ির মধ্যে? যে কাল হারিয়ে গেছে?"

জৈল সিং বলেছিল "লেড়কাটার মাথা বিলকুল খারাপ আছে।"

চান্দা সিং বলেছিল, "গোগোল, তোমার মাথা একদমই খারাপ আছে। ডাবু এখানে কী করে আসবে?"

গোগোল দুজনের হাসি আর কথায় একটু যেন বেকুফ হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল "আমার যেন মনে হল, ডাবুদাকে ভেতরে দেখলাম।"

চান্দা সিং আর জৈল সিং আবার হেসে উঠেছিল। গোগোল বলেছিল, "হয়তো আমার ভুল হয়েছিল। এবার তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।"

চান্দা সিংয়ের মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, "কী করে তোমাকে ছাড়ব? আমি শুনেছি, ডাবুকে নাকি ডাকুরা চুরি করে নিয়ে গেছে, আর তারা ডাবুর বাবার কাছে অনেক টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি গিয়ে কী বলবে না বলবে, তার ঠিক নেই, পুলিস এসে আমাকেই হয়তো ধরে নিয়ে যাবে।"

গোগোল অবাক হয়ে বলেছিল, "কেন তোমাকে পুলিস ধরে নিয়ে যাবে? তুমি তো আর ডাবুদাকে চুরি করোনি।"

চান্দা সিং গোগোলের কথার কোন জবাব দেয়নি, মাথা ঝাঁকিয়ে জৈল সিংকে ইশারা করেছিল। জৈল সিং তৎক্ষণাৎ আবার গোগোলের মুখে কষে কাপড় বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু কেবল মুখই বাঁধেনি। দু হাত পেছনমোড়া করে আগেই বাঁধা ছিল। তারপরে পা দুটোও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে, গোগোলকে বিছানায় ঠেলে দিয়ে বলেছিল, "লড়কা, তুম বাঘের সাথে খেলা করছ এবার বুঝবে।"

চান্দা সিং বলেছিল, "গোগোল, তুমি আমাকে ডাকাত বানিয়ে বিপদে ফেলতে চাও, এখন তোমারও বিপদ। আর তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। চল জৈল সিং।"

গোগোল ছটফট করে খাটের ওপর গড়াগড়ি দিয়েছিল। ও রেগে উঠে বলতে চেয়েছিল, "তোমরা নিশ্চয় খারাপ লোক, তা নইলে কেন আমাকে এভাবে বেঁধে রাখবে?" কিন্তু কোন কথাই ও বলতে পারেনি, কেবল গলা দিয়ে চাপা গোঙানি বেরিয়েছিল।

চান্দা সিং আর জৈল সিং দরজা বন্ধ করে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। গোগোলের তখন হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় হঠাৎ কান্না পেয়ে গিয়েছিল। মাত্র দুতলা নীচেই ওর মা রয়েছেন। এতক্ষণে বাবাও হয় তো অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। আধ ঘন্টা নিশ্চয় হয়ে গিয়েছিল। মা হয়তো বঙ্কিমদাকে পাঠিয়েছিলেন, গোগোলকে খুঁজতে। আর গোগোল তখন মহেশানিদের ফ্ল্যাটের ভিতরের একটা শোবার ঘরে ওই অবস্থায়!...

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে এ পর্যন্ত মনে পড়তে-পড়তেই গোগোল আবার গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি : সমীর সরকার

অচিন কলকাতা

চিত্র–পরাগ রায়
বয়স–১২ বছর

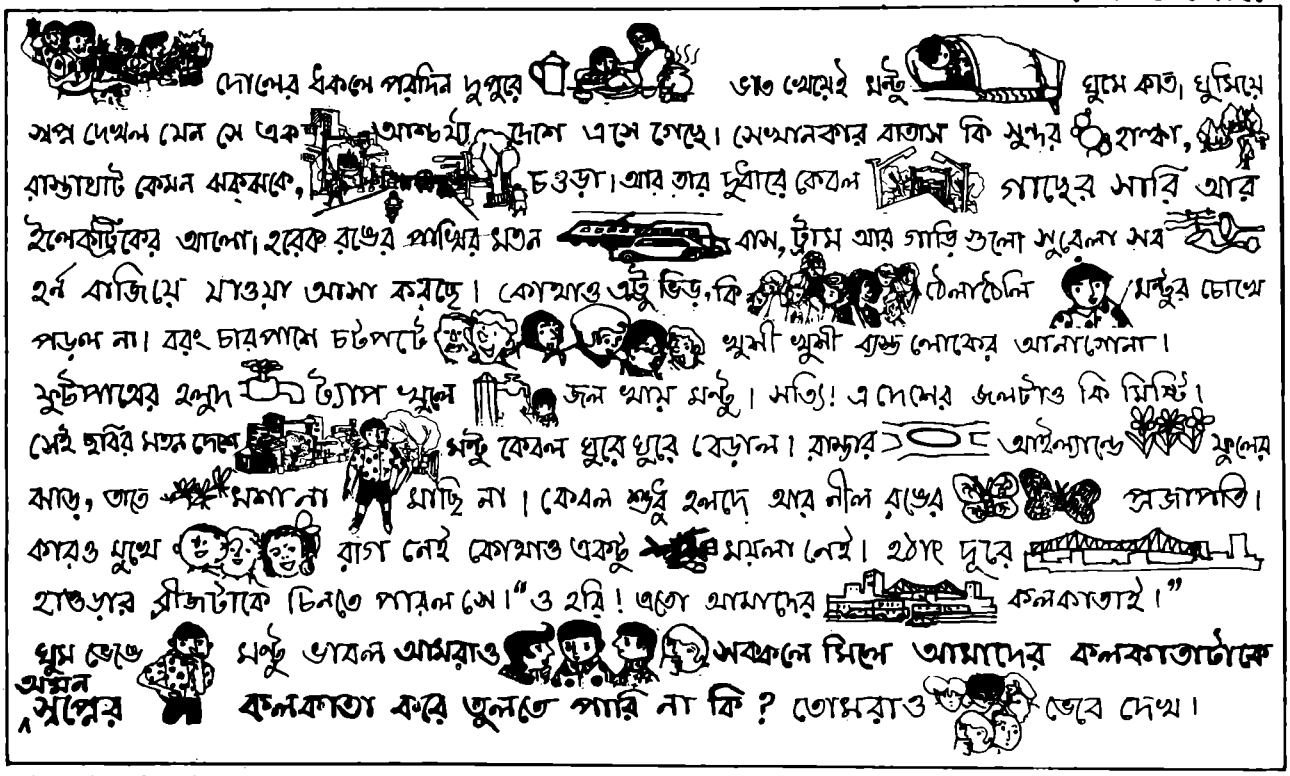

এই শহরটা মন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,–ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

শেষ মুহূর্তের দশটি পরামর্শ

হেড এগজামিনার

লেখার পরীক্ষা রীতিমত শুরু হতে আরও মাসখানেক। কয়েকদিন পরে ওয়ার্ক-এডুকেশনের পরীক্ষা শুরু হবে। ওয়ার্ক-এডুকেশনের ব্যাপারে আমার কোনো বাড়তি পরামর্শ দেবার নেই। স্কুলের মাস্টারমশাই যেমনটি বলেছেন, সেভাবে তৈরি থাকো।

লেখার-পরীক্ষার জন্য তুমি নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছ, এই শেষ সময়ে সে-বিষয়ে কিছু বলব না। তোমার তৈরি করার কৌশল তোমার মনের সঙ্গে এতটা মিশে গেছে যে, সেই রীতি ধরেই তোমায় চলতে হবে। যদি পড়া শেষ করতে বাকি থাকে, নিজের নিয়মমতো তা করে নাও, সে-বিষয়ে এই শেষ সময়ে নতুন কোনো বুদ্ধি বাত্‌লাতে যাব না। আমি পরীক্ষা দেবার কায়দাকানুনের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, এসব জানতে পারলে কোত্থেকে কিছু বাড়তি নম্বর লাভ হয়ে যাবে, বুঝতে পারবে না।

(এক) তোমার খাতা, তোমার লেখা ॥ পরীক্ষার খাতাটিকে খুব পবিত্র ব্যাপার ভাবা দরকার। তোমার বুদ্ধি-বিদ্যে জানা-শোনা যাবতীয় বিষয় ঐ খাতায় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে ধরে দিতে হবে। প্রথম পাতায় নাম, রোল নং, বিষয়, পেপার (বাংলা পরীক্ষায়) ঠিকমতো লেখা চাই। ভুল হলে অনেক হাঙ্গামা। কোথাকার খাতা কোথায় চলে যাবে। এই পাতায় যেন বানান ভুল না হয়, পরীক্ষকের মেজাজ প্রথম থেকে খারাপ করে দেওয়া বিপদের। খাতার কোথাও কালির ছোপ না পড়ে। হাতের লেখা ভাল হলে বহুত আচ্ছা, না-হলেও উপায় আছে। শব্দের সঙ্গে শব্দে, লাইনে লাইনে ফাঁক রেখে পরিচ্ছন্ন করে লিখতে হবে, যাতে পড়তে একটুও না বাধে। কোনো শব্দ বা লাইন বা অনুচ্ছেদ কেটে দিতে হলে পরিষ্কার করে কাটতে হবে, হিজিবিজি নয়। ভুল শব্দ বা বাক্যাংশের উপরে আবার লিখে সংশোধন করা মোটেই ঠিক নয়। কেটে দিয়ে উপরে বা ধারে বা মার্জিনে ঠিক কথা বসাতে হবে। প্রতি পাতার মাথায়, নীচে, বাঁদিকে ইঞ্চি-খানেক জায়গা ছাড় রাখবে। লেখার সময়ে অনুচ্ছেদের সঙ্গে অনুচ্ছেদের পার্থক্য রাখবে। প্রশ্নের নম্বরটি বাঁ-দিকে মার্জিনে নির্ভুল বসাবে। একই প্রশ্নের মধ্যে নানান অংশ থাকতে পারে; কখনো প্রশ্নকর্তা (ক) (খ) বলে তা নির্দেশ করে দেন। তুমিও (ক) (খ) নং লিখে উত্তর দেবে। যখন প্রশ্নকর্তা তা নির্দেশ করেন না, (যেমন—কীরূপ মাটিতে ভাল তুলা জন্মায়? ভারতে এরূপ মাটি কোথায় আছে?) সেখানে উত্তর দেবার সময়ে প্রতি অংশ আলাদা-আলাদা অনুচ্ছেদ করে লিখবে। একটি প্রশ্ন লেখা শেষ হলে এক ইঞ্চি মতো জায়গা ছেড়ে পরের প্রশ্ন আরম্ভ করবে। বাংলা প্রবন্ধ রচনায় প্রশ্নে-দিয়ে-দেওয়া সূত্রগুলি মার্জিনে ছোট করে উল্লেখ করা উচিত। ইতিহাস-ভূগোলেও দরকারমতো সূত্রের উল্লেখ করা ভাল।

(দুই) সময়ের দাম ॥ ছোট-বড় প্রতি প্রশ্নের জন্য কতটুকু সময় দিতে পারো, নিশ্চয়ই এতদিনে তার পরিষ্কার হিসেব জানা হয়েছে। না হলে একদিন ঘণ্টা দুয়েক খেটে সে-হিসেব তৈরি করো। কোনো প্রশ্নের উত্তর বেশি জানা বলে অনেক বেশি সময় খরচ করে ফেললে, ফলে শেষ পর্যন্ত সময়ের অভাবে একটা দুটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেল না, বা দায়সারা হল। এতে আখেরে অনেক লোকসান। বেশি সময় দিয়ে কোনো প্রশ্নে দু নম্বর বাড়তি জুটলেও সময়ের অভাবে পাঁচ ছয় নম্বর নষ্ট হবার ভয় থাকে। সময় মেনে চলতেই হবে, ঘড়ি ধরে কয়েকদিন অভ্যাস করো। টেস্ট পেপার্স নিয়ে যখন কাজ করবে, সামনে একটা ঘড়ি রেখো।

(তিন) সতর্কতা আর নির্বাচন ॥ কোন্ প্রশ্নের উত্তর লিখবে আর কোন্‌টা বাদ দিলে সুবিধা সে-বাছাইয়ের কাজটা জরুরি। তার জন্য ভাবতে গিয়ে কয়েক মিনিট খরচা হলে চিন্তার কারণ নেই। খুব নজর রাখা দরকার, রেখেয়ালে কোনো প্রশ্ন বাদ রেখে চলে এলে কিনা, অথবা প্রশ্নের মধ্যেকার ছোট-ছোট সব অংশগুলোর উত্তর দেওয়া হল কিনা। গণিতে সতর্কতা সবচেয়ে বেশি দরকার। 3-এর জায়গায় 5 লিখলে কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। + এর বদলে × ভাবলে মুস্কিল। x-কে n-এর মতো লিখো না।

(চার) বানান ॥ বানান যারা ভাল জানে, তাদেরও কচিৎ ভুল হয়। আর যারা জানে না তাদের কিন্তু মনে রাখতেই হবে বিখ্যাত আর পরিচিত নাম বা বিষয়ের বানান অন্তত যেন ঠিক থাকে। বাঙালি মনীষীদের নামের বানান ভুল করলে পরীক্ষক ঠিকই চটবেন। তোমার পাঠ্য কবিতা-গল্পগুলির (ইংরেজি বা বাংলা) নাম যেন ভুল না হয়। অন্তত এই চেষ্টা এক মাসে সফল হবে।

(পাঁচ) ফের দেখা ॥ যদি সময় করে সব খাতার রিভিশন করা যায় খুব ভাল হয়। বেশ কিছু ভুল তাতে সেরে নেওয়া যাবে। আর গণিতে যে রিভিশন করতেই হবে—সে সময়টা যে করেই হক বের করতেই হবে।

(ছয়) আগে-পরে ॥ যে প্রশ্নের উত্তর ভাল জানো সেগুলি আগে লিখবে, অবশ্য বেশি জানো বলে আত্মহারা হয়ে সময় বেশি নেবে না। কম-জানা প্রশ্ন লিখবে পরে।

(সাত) রাফ কাজ ॥ গণিতে বাঁ-ধারের পাতায় রাফ কাজ, হিসেবপত্র করতে হয়। ফেয়ার করে তোলার পরে দুটো কোনা-কুনি দাগ টেনে কেটে দেওয়া ভাল। অন্য বিষয়ে যখনই রাফ কাজ করবে তা খাতাতেই করে, পরিষ্কার কেটে দেবে।

(আট) ছবি-ম্যাপ-ছক ॥ প্রশ্নে বলে দেওয়া না থাকলেও যখনই পারবে ছবি-ম্যাপ-ছক এঁকে তোমার উত্তরের জলুস বাড়াবে। অবশ্য তাড়াতাড়ি আঁকার অভ্যাস থাকলেই এ কাজ পারবে। তাতে বেশি নম্বর আসবেই। ইতিহাসে অশোকের সাম্রাজ্য বা ভূগোলে উত্তর ভারতের নদ-নদী নিয়ে প্রশ্ন থাকলে ম্যাপ আঁকলে কত ভাল হয়। ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তরে ম্যাপ আঁকার সময় থাকে না। বড় প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু করা সম্ভব। বিজ্ঞানে তো ছবি চাই-ই।

(নয়) কিছু যেন বাদ না যায় ॥ কোন প্রশ্ন ছেড়ে আসা খুব ভুল। না-পারলেও যতটা পারা যায় চেষ্টা করে আসতে হয়। ব্যাখ্যাটা পারা যাচ্ছে না; কার লেখা কোন গল্প থেকে এসেছে তা লিখলেও দু-এক নম্বর মিলে যাবে। কোনো-কোনো প্রশ্নের মধ্যে নানা অংশ থাকে। তার কোনো অংশ যেন বাদ না যায়। পাঁচটা লিখতে বললে ভুল করে চারটে লিখে চলে এসো না।

আর সবশেষে দেব সবচেয়ে দরকারি পরামর্শ; ঘাবড়ে না গিয়ে, উত্তেজিত না হয়ে শেষ পর্যন্ত শান্তভাবে পরীক্ষা দিতে হবে, নাহলে জানা-শোনা জিনিসও তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে।

ধিক ধিক জীও জীও

কুম্ভক

ঘরে ঢুকেই নন্তু হঠাৎ ঘোষণা করল ঃ আমি কখনো নেতা হব না। আমাকে নেতা হতে বোলো না।

বাপ্ রে! এ যে একেবারে 'ডাকঘরে'র অমলের মতো কথা বললি, আমি পণ্ডিত হব না। কে তোকে নেতা হবার জন্য সাধাসাধি করছে?

করেনি কেউ। কিন্তু যদি করে তাই বলে রাখলাম।

টুম্পি বলল ঃ হবেই বা না কেন? নেতা হওয়া তো ভালো রে দাদা।

দূর।

কেন নয়?

দেখছিস না, এই ছিল জীও জীও, এই ধিক ধিক।

সে আবার কী?

এই তো, কাল যাকে মাথায় করে নেচেছে, যুগ যুগ জীও জীও বলেছে, আজ তারাই তাকে ধিক ধিক করে ধুলোয় ফেলছে। ও বাবা, ওর মধ্যে নেই আমি।

কিন্তু, আমি ভাবছি একটা অন্য কথা।—গম্ভীর চালে বলি আমি।

কী কথা? বানান নয় তো আবার?

বানান ছাড়া আমি আর কী ভাবতে পারি বল্! কিন্তু ভয় পাস না, এটা একটা সোজা ব্যাপার। তোর বলা ওই ধিক ধিক জীও জীও-টা মাথায় ঢুকে গেছে। এই দুটো শব্দের একটা হ্রস্ব ই আরেকটা দীর্ঘ ঈ তো?

তাই তো লেখে দেখি দেয়ালে।

ব্যস, এইটে মনে রাখবি তো সব সময়ে।

কী হবে মনে রাখলে?

তাহলে ইক আর ঈয়-র ই-ঈটা ঠিক থাকবে। তাহলে কেউ আর রাষ্ট্রিয় লিখে ফেলবি না ভুল করে। তাহলে মনে রাখতে পারবি যে ইক হলে ই আর ঈয় হলে ঈ। রাষ্ট্রিক, কিন্তু রাষ্ট্রীয়। স্থানিক, কিন্তু স্থানীয়। আত্মিক, আত্মীয়। জাতিক যেমন আন্তর্জাতিক, কিন্তু জাতীয়। ধর্, যদি একটা শব্দ লিখতে চাই 'শেক্সপিয়ার সম্পর্কিত', তাহলে কী লিখব?

শেক্সপিয়ারীয়?

হ্যাঁ। উচ্চারণ করা একটু শক্ত হয় বটে, বড্ড লম্বা। ইংরেজিতে অবশ্য আরো লম্বা, শেক্সপিয়ারিয়ান। তেমনি যদি বলি ভিক্টোরিয়ান, তার বাংলা কী হবে?

নন্তুর আবৃত্তিপ্রতিভা উথলে উঠল অমনি। বলল ঃ ভিক্টোরিয়ানই হবে। রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেন

অতএব, মন, তোর কলসী ও দড়ি আন
অতলে মারিস ডুব মিড-ভিক্টোরিয়ান।

লেখেননি?

তা লিখেছেন। কিন্তু সব সময়েই যে ও-রকম লিখেছেন বা লেখা ভালো, তা নয়।

টুম্পি বলল ঃ তাহলে হবে ভিক্টোরীয়।

ঠিক। ভিক্টোরিয় বা ভিক্টোরিও নয় কিন্তু। জ্ঞানীগুণীরাও ও-রকম লিখে বসেন অনেক সময়ে।

কেন লেখেন?

হয় কী জানিস, ওই ভিক্টোরিয়া শব্দের ই-টাই চোখে থেকে যায়, তার ওপর য়-টাও আছে—ভিন্ন একটা ঈয় প্রত্যয় যে যোগ হচ্ছে সেটা আর খেয়াল থাকে না বড়ো।

কিন্তু এক দেশের শব্দের সঙ্গে আরেক দেশের প্রত্যয় মিলে যায়?

নন্তু ধমক দিয়ে বলে ঃ যাবে না কেন? এক দেশের ছেলের সঙ্গে আরেক দেশের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না? ও-বাড়ির হরেন-কাকুর জার্মান বৌ আছে না?

ভাষা বিষয়ে নন্তুর এই সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানে স্তম্ভিত হয়ে যাই। নন্তু বলতে থাকে ঃ এমন অনেক হয়, ব্যাকরণে দেখেছি। কিন্তু সম্মানীয় লোকেরাও ও-রকম ভুল লেখেন কেন, সেই হচ্ছে কথা।

এই রে, তুই তো করলি আরেক বিপদ। সম্মানীয় পেলি কোথায়, ওটা হলো সম্মাননীয়। মাননীয় তো জানিস? তেমনি সম্মাননীয়।

একটু থমকে থেকে নন্তু জিজ্ঞেস করে ঃ ধর্ম থেকে ধর্মীয়, জল থেকে জলীয়, দেশ থেকে দেশীয়, তাহলে সম্মান থেকে সম্মানীয় নয় কেন?

তার কারণ ওটা যে একেবারে আলাদা কাণ্ড! ধর্মীয় মানে ধর্ম-সম্পর্কিত, তেমনি জল-সম্পর্কিত, দেশ-সম্পর্কিত। তুই তো আর সম্মান-সম্পর্কিত কোনো কথা বলতে চাইছিস না। তুই বলছিস যাঁকে সম্মান করা যায়, মান দেওয়া যায়, তাঁর কথা। এখানে একটা কাজের ব্যাপার থেকে গেছে না? আসলে এর প্রত্যয়টাই তাই আলাদা। এটা ঈয় নয়, এ হলো অনীয়। এটা শব্দের সঙ্গে জোড়া তদ্ধিত প্রত্যয় নয়, এ হলো ধাতুর সঙ্গে জোড়া কৃৎ প্রত্যয়। যা করতে হবে, কৃ অনীয় করণীয়। যা মনে রাখতে হবে, স্মৃ অনীয় স্মরণীয়। যা বলা যায়, বচ্ অনীয় বচনীয়।

যার থেকে অনির্বচনীয়?

হ্যাঁ রে। ঠিক তেমনি, যাকে মান দেওয়া যায়, মাননীয়। আরেকটু জোর দিয়ে বললে সম্মাননীয়। কিন্তু অতটা জোর দেবার দরকারই বা কী? দেখতেই তো পাচ্ছিস, কাল ছিল স্বর্গীয়, আজ দানবিক! কাল ছিল জীও জীও, আজ ধিক ধিক!

শান্তিনিকেতনের পলাশ

বসন্তের আগে থেকেই শান্তিনিকেতনের সমস্ত পলাশ গাছে কুঁড়ি দেখা দেয়। তার পরেই ফুলগুলি প্রজাপতির মত পাখনা মেলে দিয়ে ফুটতে আরম্ভ করে। তখন গাছের তলায় তিন-চারটে বা বড়জোর সাত-আটটা ফুল ঝরে পড়ে থাকে। কিন্তু যত দিন যায়, ততই গাছেও ফুলের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ঝরে-পড়া ফুলগুলিও অনেক হয়ে ওঠে। বসন্তের মাঝামাঝি মনে হয় যেন সারা শান্তিনিকেতন জুড়ে আগুন লেগেছে। আর সেই আগুন যেন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকের ঘাসে, পাতায়।

কিন্তু এ-আগুন তো আর সত্যিকার আগুন নয়, সত্যিকার আগুনের স্পর্শ যেমন যন্ত্রণাদায়ক, এর স্পর্শ তেমনি মধুর। পলাশ ফুল দেখে আমরা যেমন আনন্দ পাই, পাখিরাও তেমনি আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। পলাশ ফুল দেখে তারা যে আনন্দ পেয়েছে, নানারকম মিষ্টি সুরে কিচমিচ করে ডেকে তা আমাদের জানায়। ক্লাসে বসে যখন দেখতে পাই দূরে আকাশ লাল করে পলাশ ফুল ফুটে রয়েছে, আর সাঁওতাল মেয়েরা ফুলগুলি সযত্নে তুলে নিয়ে কানে পরছে, তখন কি আর ক্লাস করতে ইচ্ছে করে! মনে হয় এই অঙ্ক-ক্লাস থেকে যদি পালাতে পারতাম, তা হলে আমরাও সাঁওতাল মেয়েদের মত মজা করতাম।

পলাশ ফুল দেখে মনে হয়, এই যে এত ফুল, এদের নিয়ে কী করব! আর কদিন পরেই তো এরা শেষ হয়ে যাবে, তখন এদের কোথায় পাব! ইচ্ছে হয়, একটা কবিতা লিখি এদের নিয়ে। কিন্তু লেখার সময়ে মনের মতন ভাষা খুঁজে পাই না। তখন আবার খারাপ লাগতে থাকে। এমন বসন্ত প্রায় শেষ হয়ে এল। সব পলাশ ফুলও কিছুদিন পরেই ঝরে যাবে। পলাশ ফুল শেষ হয়ে গেলে চারিদিকটা যেন ভীষণ ফাঁকা মনে হয়, মেজাজটা কেন যেন থেকে-থেকে খারাপ হয়ে ওঠে। মনে হয় সব আনন্দ যেন শেষ হয়ে গেছে, এরপর আসবে অসহ্য গরম আর কষ্টের দিন। ওরা চলে যাবে ভেবে আমাদের খুব কষ্ট হয়, কিন্তু ওরা কি জানে যে আমরা ওদের এত ভালোবাসি? বেশ তো ওরা আপন মনে চারিদিক ফাঁকা করে দিয়ে চলে যায়। কই, এতটুকু কষ্টও তো ওদের হয় না। সত্যি কি ওরা নিজেই চলে যায়? নাকি প্রকৃতি ওদের জোর করে সরিয়ে দেয়?

ঈশিতা চক্রবর্তী (বয়স—১০)

পিঁপড়েদের পুরীভ্রমণ

আমাদের ঘরে একবার খুব পিঁপড়ের উৎপাত হয়েছিল। আমাদের ঘরে পিঁপড়েরা কীভাবে এল তা এবার বলি। ওদিকের গাছ-গাছড়ার আড়ালে পিঁপড়েদের একটা প্রকাণ্ড ঢিবি ছিল। সেখানে থাকত হাজার হাজার পিঁপড়ে। একদিন তারা খাবার নিয়ে বাসায় ফেরার সময় আমাদের বাড়িটা দেখতে পেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাই তারা আর আমাদের বাড়িতে ঢুকল না, পরদিন সকালে তারা সৈন্যদের মতো কুইক মার্চ করতে করতে আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকল। আমাদের বাড়িটা তাদের খুব পছন্দ হয়ে গেল, তাই এখানেই তারা বসবাস শুরু করল। কিছু-দিনের মধ্যে সমস্ত খাবার, বিছানা, ডাইনিং

ছবি এঁকেছে তপোব্রত পাল (বয়স ১০)

টেবিল ভরে গেল পিঁপড়েতে।

একদিন পিঁপড়েদের রানী বলল: এই ছোট্ট ঘরে থাকতে আর ভাল লাগছে না, মানুষেরা যেমন বেড়াতে যায় আমরাও তেমনি যাব। তোমরা প্রস্তুত হও, কাল ভোরেই আমরা পুরীতে রওনা দেব। সেখান থেকে যাব হরিদ্বার, তারপর মানস সরোবর। পরদিন ভোরে পিঁপড়েরা প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর সবাই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে পুরীতে পৌঁছল। সেখানে দু-চারদিন থাকার পর একদিন পিঁপড়েরা তাদের রানীকে বলল, আমরা একটু সমুদ্রে চান করতে যাচ্ছি। রানী বলল: যাও। তখন তারা চান করতে গেল।

পিঁপড়েরা সাঁতার জানে, কিন্তু সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে পারবে কেন? একটা বিরাট ঢেউ এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর তারা ডুবে গেল সমুদ্রে। বেঁচে রইল শুধু তাদের রাজা আর রানী।

সুমন্ত বসু (বয়স—৯)

চিঠি

এই পত্রিকাটি পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। ভাল লাগে বলেই খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলি। তারপর সারা মাস ধরে দিন গুনতে হয় পরের সংখ্যার আনন্দমেলার জন্য। পত্রিকাটি কি পনের দিন অন্তর বার করা যায় না?

কল্পনা দে (বয়স ১০)

আমি মাসিক আনন্দমেলার একজন পাঠক। আমার টারজান ও টিনটিন পড়তে খুব ভাল লাগে। কাগজটি পাক্ষিক হলে খুব ভাল হয়।

শুভময় গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ৭)

আমি মাসিক আনন্দমেলার গ্রাহিকা। আমাদের বাড়িতে যত কাগজ আসে তার মধ্যে সব চাইতে ভাল লাগে এই পত্রিকাটি। শারদীয় আনন্দমেলা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এই পত্রিকাটি পাক্ষিক করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপমন্যু পাঠক (বয়স ১২)

আমি মাসিক আনন্দমেলার একজন নিয়মিত পাঠিকা। আমি আসামে থাকি। প্রতি মাসে আনন্দমেলার জন্যে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। এই পত্রিকাটি পড়তে আমি ভীষণ ভালবাসি। সব চাইতে ভাল লাগে ওয়াল্ট ডিজনির গল্পমালা। অন্যান্য নিয়মিত বিভাগও ভাল লাগে। আনন্দমেলাকে পাক্ষিক করলে খুব ভাল হয়।

ইলোরা সেনগুপ্ত (বয়স—১২)

সিনেমা হলে ঘেউ-ঘেউ

আমাদের মামার বাড়িতে একটা সাদা-কালো রংয়ের কুকুর ছিল। তাকে সবাই কাবলি বলে ডাকত। সে খুব তেজী কুকুর ছিল। বাড়িতে নতুন কেউ এলে কাবলি ঘেউ-ঘেউ করে ডাকত। বাড়ির থেকে কেউ কোথাও বেড়াতে গেলে কাবুলি তাদের পিছু-পিছু যেত। কাবলি মেজমামার খুব প্রিয় ছিল।

একদিন আমার মা আর মাসীরা সবাই মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সিনেমা হলের মধ্যে ঘেউ-ঘেউ ডাক শুনে মায়েরা চমকে উঠে দেখেন, কাবুলি। তারপর কাবুলি আর একবারও ঘেউ-ঘেউ না করে মায়েদের পাশে বসে সারাক্ষণ সিনেমা দেখল।

নন্দিনী বসু (বয়স—৭)

ছুটিতে

মামাবাড়ি বাগনান
মাসিবাড়ি বাইনান
স্কুলের এ ছুটিতে
ভাইবোন দুটিতে
বেড়াবার প্রোগ্রাম।

পার্থপ্রতিম দাস (বয়স—১১)

দুষ্টু বাঁদর

আমাদের হাতে এল
কয়েকটা বাঁদর,
আমি তাদের বললাম
করব আদর—
তাও তারা নিয়ে গেল
মায়ের চাদর।

পার্থ দে (বয়স—৬)

বাঘের জ্বর

বাঘের বড় জ্বর হয়েছে
মাংস খেতে মানা,
থরথরিয়ে কাঁপে দেহ
ওষুধ [illegible] জানা।
মাথার বাগানে কাঁদে বড়
শিকার ধরবে কী!
শিয়াল মামা [illegible]
ঘাসের চাপা [illegible]

শংখ সরকার [illegible]

বিজয়ী বাংলার চারজন

শ্যাম থাপা

সুব্রত ভট্টাচার্য

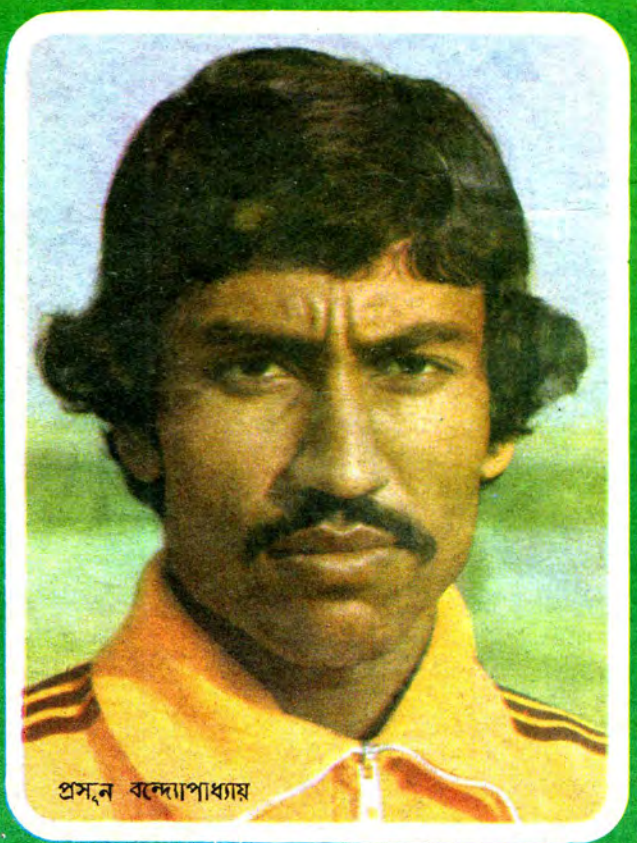
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

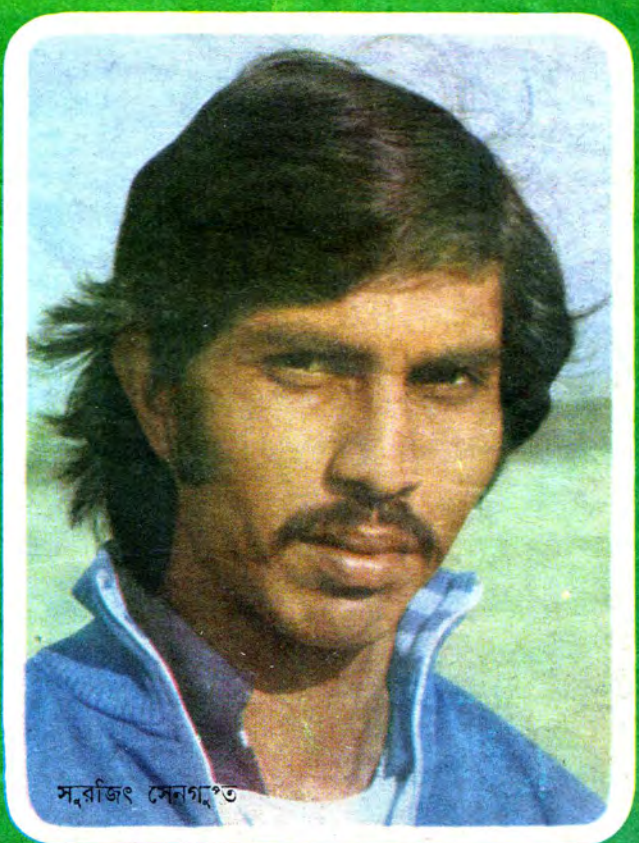
সুরজিৎ সেনগুপ্ত

ফোটো তপন দাশ

নদের খেলা দেখছেন প্রবীণ পাঁচ খেলোয়াড়। (বাঁ দিক থেকে) থঙ্গরাজ, আজিজ, চুনী গোস্বামী, বাঘা সোম ও আমেদ হোসেন

পরাস্ত পাঞ্জাবের দুজন

হরজিন্দর সিং

ইন্দর সিং

(খেলার বিবরণ ছত্রিশের পাতায়)

আজব দেশে

সুনীল দাশ

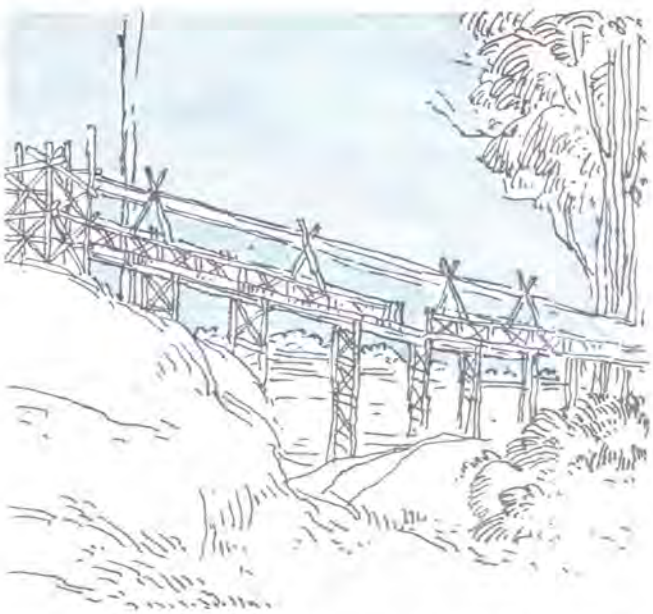

সামনে ওই মস্ত হাঙরটার মুখোমুখি এসে পড়ে গাড়ির আর-সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঋকও চেঁচিয়ে উঠল।

আমরা গিয়েছিলাম পৃথিবীর সব চাইতে বড় ফিল্ম স্টুডিও "ইউনিভার্সাল" দেখতে। হলিউডের নাম ঋক তার ভূগোল বইতে পড়েছে, তাই এখানে আসার কথা পাকা হলে ও আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। একটু আগেই স্টুডিওর গাড়ি চেপে যখন আমরা ওই কৃত্রিম সমুদ্রের পাশ দিয়ে আসছিলাম, নীল জলের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল আমাদের গাড়িটা, তখন ঋকই বলেছিল, "ওই দেখো ছোটকাকু, জলের মধ্যে ছোট্ট একটা বোট নিয়ে সাহেবটা কেমন মাছ ধরছে।"

ডাঙা থেকে একটু দূরে একাগ্রমনে ছিপ হাতে বোটের ওপর বসে ছিল সাহেবটি। একটুও নড়ছিল না। হঠাৎ জলে ঢেউ উঠল। ঘাই দিয়ে উঠল কী যেন একটা। জল দুলে উঠে উলটে দিল বোটটাকে। চোখের পলকে সাহেব চলে গেল জলের মধ্যে, আর সেই সঙ্গে বোটটার কাছে খানিকটা নীল জল—জলের মধ্যে চাপ-চাপ রক্ত মিশলে যেমন দেখায়—তেমন হয়ে উঠল। আমরা যখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম তখন আচমকা জলের একেবারে ধারে এসে আমাদের গাড়িটা কাত হয়ে পড়ল। জল তোলপাড় করে গাড়ির জানলার কয়েক হাতের মধ্যে উঠে এল বিশাল একটা হাঙরের হাঁ-মুখ। ঋক কাঁদেনি, কিন্তু অনেকগুলো ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে কেঁদে উঠল গাড়ির মধ্যে। চব্বিশ ফুট লম্বা ওই হাঙরটার একেবারে দাঁতের নাগালে এসে পড়ে আঁতকে ওঠেনি এমন লোক গাড়িতে একজনও ছিল না।

অথচ, মোটামুটি সবাই জানে, জল ঠেলে উঠে আসা ওই হাঙরটা সত্যিকারের নয়। ওটা "জ" (Jaw) নামে একটা চলচ্চিত্রের জন্যে বানানো যান্ত্রিক হাঙর। আর বোটে-বসা মাছধরার লোকটাও যে সত্যিকারের মানুষ নয়, খানিক পরেই বোঝা গেল ভাল করে। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। এর পরেই হাঙরটা আবার ডুবে গেল। আমাদের কাত হয়ে যাওয়া স্টুডিওর গাড়ি সোজা হল। আর, জলের মধ্যে ছোট সেই বোটটা ভেসে উঠল আবার। সাহেবটি মাছ ধরতে লাগল আগের মতো।

চমকের পালা চলেছে একের পর এক। সারা দুনিয়া থেকে দর্শক আসে এই স্টুডিও - শহর দেখতে। বেশি মজা পায় ছোটরা। ১৯৭৬ সালেই ৩০ লক্ষ দর্শক ছুটে এসেছে এখানে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে।

ইউনিভার্সাল সত্যিই তুলনাহীন। পাহাড়ের কোলে চারশো একরের বেশি জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এই স্টুডিওর মধ্যে পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই। কৃত্রিম সমুদ্র, হ্রদ, জল-প্রপাত, শতশত প্রাসাদ, আধুনিক এবং মধ্যযুগের শহর, গঞ্জ, তুষারাঞ্চল, মাইলের পর মাইল রাস্তা, নিজস্ব রেলপথ, ডাক-ঘর, ব্যাঙ্ক, ফায়ারব্রিগেড—সবই আছে।

লস এঞ্জেলেসে এসে চওড়া-চওড়া সুন্দর সাজানো রাস্তা দেখে খুব ভাল লেগেছে ঋকের। পাশাপাশি ছটা গাড়ি যেতে পারে, আসতে পারে আরও ছটা একসঙ্গে। এগুলোর নাম ফ্রী ওয়ে। রাস্তা পারাপার করার জন্যে যে আলো জ্বলে তাতে লেখা থাকে, "Walk" কিংবা "Don't walk"। সেই রকম একটা রাস্তা ধরে সান্তামনিকা বুলেভার্ড থেকে বেশ সকাল সকাল ঋককে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছেছি এখানে। স্টুডিও শহরে প্রবেশ তোরণের আগে পাহাড়ের মাথায় আছে গাড়ি রাখার জায়গা। সেখানে গাড়ি রেখে—স্টুডিওর ভেতরে এসে উঠেছিলাম এই গাড়িতে। ইউনিভার্সালের নিজস্ব গাড়ি। এগুলোর নাম "ট্রলির ট্রাম"। স্টুডিও শহরে ঢুকতে মাথা পিছু ছ-ডলার লাগে।

প্রতিটি ট্রলির ট্রামে থাকে তিনটে ক'রে কামরা। একটা কামরায় গিয়ে বসলাম আমরা। ঋক বসল ধারের দিকের আসনে। গাড়ি চলতে শুরু করল, খানিক পরেই ঋক বলে উঠল, "ছোট কাকু, ওই দেখো বোল্ডার! বোল্ডার!"

তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ির ডানদিকে—পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অসংখ্য বড় বড় পাথর হুড়মুড় করে গড়িয়ে নামছে। ওর একটা গায়ে এসে পড়লেই গুঁড়িয়ে যাব। ওগুলো দ্রুত গড়িয়ে নামছে ঠিক যেন গাড়িতে আছড়ে পড়বে বলেই! পড়লও। তবে পড়ে গাড়ি কিংবা যাত্রীদের কাউকে আহত করল না, ছিটকে গেল। ঋক হাসতে শুরু করল। সত্যি ওই বিশাল

বিশাল পাথরের চাঁইগুলো নিজে হাতে তুলে না দেখলে কার সাধ্য বোঝে যে ওগুলো স্পঞ্জের তৈরি। পরে দেখলাম ঋকের চাইতেও অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ফটো তোলার জন্যে ওগুলো তুলে নিয়ে এটলাসের ভঙ্গিতে পৃথিবী ঘাড়ে করে দাঁড়াচ্ছে।

হঠাৎ দেখি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা মস্ত দালানে। মুহূর্তে আবার নিভে গেল। বাড়িটা দেখলাম অক্ষতই আছে।

ঋকের কাছে সবচেয়ে বড় জাদু ছিল "রেড সী"র জল দু ভাগ হয়ে যাওয়া। ওখানে ছশো ফুট লম্বা আর দেড়শো ফুট চওড়া জলাধারটির নাম "রেড সী"। আমাদের শ্লেমর ট্রাম তার কাছে যেতেই দেখা গেল নদীর জল মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ি চলে এল তার ভেতর দিয়ে। আর গাড়ি নদী পেরিয়ে যাবার পরেই ভাগ হয়ে যাওয়া জলের ধারা আবার আগের মতো একাকার হয়ে গেল। বৈদ্যুতিক কুহকের এমন মজায় তাজ্জব বনে গিয়ে ঋক তো খানিকটা সময় কোনো কথাই বলতে পারল না।

চমকের পর চমক। একটার ঘোর কাটতে না কাটতেই আর একটা এসে পড়ে। মাঝারিগোছের একটা কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল শ্লেমর ট্রাম। নীচে হ্রদ। জানলা দিয়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম নীচের দিকে। আচমকা সেতুর এক পাশের ভারি কাঠামো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল নীচের হ্রদে। ধাক্কা সামলে শান্ত হলে দেখা গেল, ভাঙা কাঠামো আবার উঠে গিয়ে জোড়া লেগে যাচ্ছে।

ইউনিভার্সাল স্টুডিওর তোলা বিখ্যাত ছবিগুলোর নানান স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। "দি স্টিং", "অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট", "আর্থকোয়েক"; "এয়ারপোর্ট ১৯৭৫", "জ", "স্পার্টাকাস"-এ স্টুডিওর গৌরবের অন্ত নেই। আলফ্রেড হিচকেকের বিখ্যাত ছবি "সাইকো"র বাড়িটাকে দেখাতে ঋক বলল, "বাড়িটার দিকে তাকালেই কীরকম যেন গা-ছমছম করে ওঠে, তাই না?"

সারা স্টুডিও-শহর জুড়ে এইসব বড় বড় চমক ছাড়াও ছোটদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এত অসংখ্য জিনিস আছে যে, মনে রাখা মুশকিল। পথের মাঝখানে আচমকা বন্যার জল এসে পড়া, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত কিংবা চোরাবালির মধ্যে আর্তনাদ করতে-করতে স্টুডিওরই কোন কমীর ডুবে যাওয়ার মতো দৃশ্য যে কত আছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে আর একটা বিস্ময়, ঋক যেটার কথা কখনই ভুলতে পারবে না সেটা হল তুষারাঞ্চলের ঘূর্ণিপাক। বাব্বা! কয়েক মিনিট ধরে কী কাণ্ডটাই যে হল!

শ্লেমর ট্রাম উঠে আসছিল ওপর দিকে। অল্প উঠতেই দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে লেখা—২৪,০০০ ফুট উচ্চতা। তারপর গাড়িটা বাঁক নিয়েই একটা বড় সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেল। সুড়ঙ্গের ঝকঝকে বরফের মতো দেওয়াল ঘুরতে শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে হিমবাহের ধস নেমে আসার প্রচণ্ড শব্দ। ভয়ে বুক গুঁড়িয়ে যাবার জোগাড়। যেন হিমবাহের ধসে নেমে যাচ্ছি সবাই।

সকাল থেকে বিকেলের আগে পর্যন্ত এসব দেখেই কাটল। বিকেল থেকে আবার অন্যরকম মজা। হাজার-হাজার দর্শক বসতে পারে এমন এক এমফিথিয়েটারে বসে দেখা গেল তালিম নেওয়া কুকুর আর কাকাতুয়ার খেলা। দুজন দর্শককে আমাদের সামনেই সাজান হল মিস্টার আর মিসেস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। অন্য আর এক জায়গায় দর্শকদের নিয়েই একটা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের শুটিং তুলে তক্ষুনি সেটা আবার দেখিয়ে দেওয়া হল পর্দায়।

ছবি অনুপ রায়

তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

ডোডোবাবু তাতাইবাবুদের পাড়ায় এখন ঘরে ঘরে টিভি মানে টেলিভিশন গিজগিজ করছে। প্রত্যেক ছাদে টেলিভিশনের এণ্টেনার নিশানা, এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে পাশাপাশি দুই ঘরে দুটো টিভি। অবশ্য ডোডোবাবু বা তাতাইবাবু কারো বাড়িতেই টিভি নেই।

তবে কোনো কোনো দিন ক্রিকেট কি ফুটবলের কোনো ব্যাপার থাকলে, কিংবা ধাঁধা প্রতিযোগিতা যদি হয়, তাতাইবাবু পাড়ায় বন্ধু-বান্ধবের কারো বাড়িতে টিভি দেখতে যান। কী একটা ছুটি পড়েছিল মধ্যে, ডোডোবাবু তিনদিনের জন্যে বাড়িতে এলেন। এই সময়েই টিভিতে এক সন্ধ্যায় মার-মার কাট-কাট আকর্ষণ, ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টেস্টের ছায়াছবি কলকাতা দূরদর্শনে দেখানো হবে। তাতাইবাবুদের বাড়ির উল্টোদিকের দোতলায় বড়ুয়াকাকাদের বাড়িতে পাশাপাশি দুটো ঘরে দুটো টিভি। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে ঐ দোতলাতেই খেলা দেখতে গেলেন। একটা টিভি এমনিই সাধারণ যে রকম হয়, কিন্তু আরেকটার চার পায়ের নীচে চাকা লাগানো, ইচ্ছে করলেই গাড়ির মত ঘরের একপাশ থেকে আরেক পাশে গড়গড়িয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়। ডোডোবাবু তাতাইবাবু দুজনেরই খুব মজা লাগল এই টিভিটা দেখে। ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, "অনেকদিন পরে যখন এই টিভিটা একদম খারাপ হয়ে যাবে, তখন ইচ্ছে করলে এই টিভিটা দিয়ে বাচ্চাদের প্যাসাম্বুলেটার বানানো যাবে।"

দূরদর্শনে ক্রিকেট খেলা শুরু হল। বেশ ঝলমলে খেলা। দুজনেই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন, ঘরে বাড়ির ও বাইরের আরো অনেক লোক, উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা চলছে, এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং, সব অন্ধকার। দর্শকেরা সবাই বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু। সিঁড়িতে এসে ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, "লোডশেডিং হলে কী হবে, এই টিভিটা কিন্তু চালানো যাবে।" তাতাইবাবু জানতে চাইলেন, "কী ভাবে, ব্যাটারি দিয়ে?" ডোডোবাবু জবাব দিলেন, "কেন, ব্যাটারি লাগবে কেন, এটার তো চাকা আছে।"

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

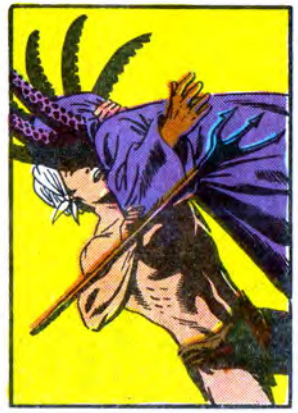

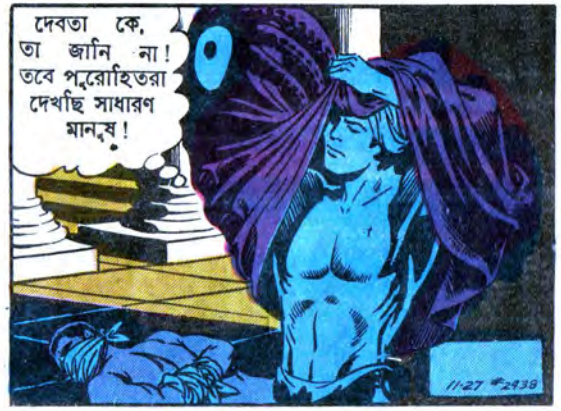

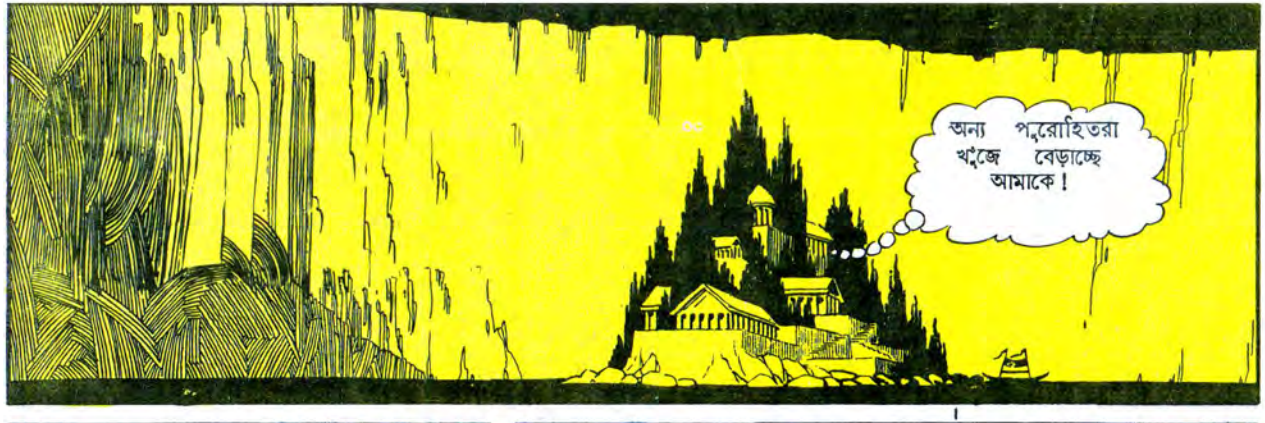

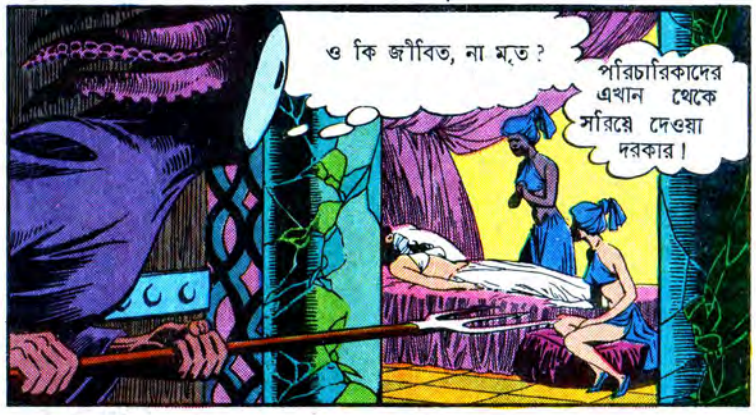

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

গত বছর পেলে কলকাতায় এসে কিছুদিনের জন্যে মাতিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে, কিন্তু এবার কলকাতা ঠান্ডা হয়ে রইল বাইরের কোনো ক্রিকেট টিম এল না বলে। অবশ্য, দারুণ ভাবে হয়ে গেল এখানে সন্তোষ ট্রফির খেলা। আমার সরলকাকার মতো ক্রিকেটের ভক্তদের মন খারাপ, তবে কেউ কেউ রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শুনে উত্তেজনার আগুন পোহাল। সরলকাকা ক্রিকেটের টুপি পরে কিছুদিন মাঠে ঘোরাঘুরি করলেন, যদি ভাল কোনো প্র্যাকটিস দেখা যায়! একদিন দেখলেন, কিছু স্কুলের ছেলে বিরাট মাঠে দারুণ হৈ-চৈ করে ক্রিকেট খেলছে। সরলকাকা সেদিন ওদের খেলা দেখে তো দারুণ খুশি, আমি ওই খুশি-খুশি মুখটিকে আট টুকরো দিয়ে তৈরি করে রেখেছি তোমাদের জন্যে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

পদবী নিয়ে ধাঁধার কথাটা যে এমন ছড়িয়ে যাবে ছোটকাও বুঝতে পারেনি। ছোটকার অফিসেরই তিনটে ছেলে ছোটকাকে হঠাৎ ধরেছে।

তিনটে ছেলেই অল্পবয়সী। নতুন ঢুকেছে অফিসে। তিনজনেই রানাঘাট লাইন থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। ছোটকা যে নানান মজার ধাঁধা বলতে পারে, সে কথা অফিসের সবাই জানে। এই ছেলে তিনটেও ছোটকার কাছ থেকে এর আগে কখনো সখনো মজার ধাঁধা দু-চারটে শুনেছে। কিন্তু পদবীর ধাঁধাটা পড়ে নাকি তিনজনেই দারুণ উত্তেজিত। কে আগে উত্তর করতে পেরেছে তাই নিয়ে নয়, উত্তরটা নাকি করতেই পারেনি। কেবলই নাকি গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে।

তাই অগতির গতি ছোটকাকেই ধরা।

ছোটকার পক্ষে উত্তর দিতে আর কত সময় লাগবে। ছোটকা যখন উত্তর করে দিয়েছে, তিনজনেই চুপ। ব্যাপারটা যত গোলমেলে লেগেছিল তেমন গোলমেলে যে নয় বুঝতে পেরে চুপচাপ ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু পরদিনই আবার হাজির। সঙ্গে একটা নতুন ধাঁধা। এ-ধাঁধাটাও পদবী নিয়ে। ছোটকা ধাঁধাটা পেয়ে খুব খুশি। ছেলে তিনটেকে উত্তর তো করে দিয়েইছে, একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে এবারের **প্রথম ধাঁধাও** বানিয়ে দিয়েছে ছোটকা।

এবার বরং তোমরা উত্তর করে দ্যাখো।

প্রথম ধাঁধা। শিয়ালদা-রানাঘাট লাইনে তিনজন প্যাসেঞ্জার রোজ ট্রেনে চেপে কলকাতায় যাতায়াত করে।

তিনজন যাত্রীর পদবী হল, ঘটক, পত্রনবিশ এবং সরকার। মজার ব্যাপার হল, যে-গাড়িটায় রোজ তারা আসে সে গাড়িটার ড্রাইভার, চেকার আর গার্ড—এই তিনজনেরও পদবী ঘটক, পত্রনবিশ আর সরকার। বলা বাহুল্য, পদবীগুলো এলোমেলোভাবে বলা হয়েছে। কেননা ধাঁধাটা হল—ড্রাইভারের পদবী কী তা বার করতে হবে।

কী করে করবে ভাবছ? নীচে ছটা সূত্র দেওয়া হল, তাই থেকে বার করতে হবে।

(ক) প্যাসেঞ্জার ঘটক রানাঘাটে থাকে।

(খ) গার্ড থাকে ব্যারাকপুরে ও রানাঘাটের ঠিক মাঝখানে একটা জায়গায়।

(গ) গার্ডের পদবী যে-প্যাসেঞ্জারের পদবীর সঙ্গে এক, সেই প্যাসেঞ্জারটি থাকে ব্যারাকপুরে।

(ঘ) গার্ডের সব থেকে কাছাকাছি থাকে যে-যাত্রী, তার মাইনে গার্ডের ঠিক তিনগুণ।

(ঙ) প্যাসেঞ্জার পত্রনবিশ মাইনে পায় মাসে ৪০০ টাকা।

(চ) রেল-অফিসের বার্ষিক স্পোর্টসে সরকার চেকারকে দুশো মিটার দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছে।

এবার বলো তো, ড্রাইভারের পদবী কী?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কলকাতা থেকে একটা নন-স্টপ ট্রেন ধানবাদ যাচ্ছে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে। ধানবাদ থেকে একটা নন-স্টপ ট্রেন কলকাতার দিকে আসছে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে। দুটি ট্রেনের
হবে নিশ্চিত। দেখা হবার
দুটো ট্রেন কত মাইল দূরত্বে

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ সালটি কো

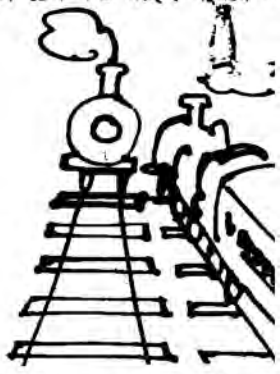

১৮৯৬

১৯২০

১৯৪৪

১৯৭২

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসি
করো,

২ ৪ ৩ ৬ ৪ — ৫ ১০

গতবারের উত্তর ॥ প্রথমে
ধরা যাক। তাহলে বাকি তিন
সেক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দস্তরী ইঞ্জি
অনুসারে শ্রীযুক্ত মার্চেন্টও
অবাস্তব।

দ্বিতীয় বাক্যটি সত্যি
কনট্রাকটর দস্তরী, মার্চেন্ট
আড়তদার। তাহলে শ্রীযুক্ত দস্

তৃতীয় বাক্যটিকে সত্যি ধরা
ইঞ্জিনীয়ার আড়তদার, শ্রীযুক্ত
নন। শ্রীযুক্ত দস্তরী আড়তদা
হতেই পারেন না। তাহলে
কনট্রাকটর।

চতুর্থ বাক্যটিকে সত্যি
ইঞ্জিনীয়ার আড়তদার নন, শ্রীযু
শ্রীযুক্ত কনট্রাকটর দস্তরী
কনট্রাকটর হতেই পারেন না, তা
আড়তদার।

শ্রীযুক্ত দস্তরী সেক্ষেত্রে ক
সুতরাং অন্য যে য হোক
কনট্রাকটর এটা জানা যাচ্ছে।

(২) ১০ মিনিট পরে

(৩) ইংরেজি বানানে 'Tw
আসছে। সুতরাং এ-রকম ইংরেজি

(৪) মেয়ে হলে হয়।

(৫) ১১

সত্যসন্ধ

ছবি অহিভূষণ মালিক

...নের এক সময় পথে দেখা
হ... ঠিক এক ঘন্টা আগে
...য়ে থাকবে ?

...টি বেমানান ?

১৯২৮
১৯১৪
১৮৯২
১৯০৪

...খ্যা বসিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ

: ১০ ৬
প্রথমে প্রথম বাক্যটিকে সত্যি
কি তিনটে মিথ্যে ধরতে হবে।
...ী ইঞ্জিনীয়ার, আবার (গ)
...র্চেণ্টও ইঞ্জিনীয়ার। সেটা

সত্যি ধরা যাক। শ্রীযুক্ত
...র্চেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ার
...যুক্ত দস্তরী হন কনট্রাকটর।
...ত্যি ধরা যাক। সেক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত
শ্রীযুক্ত দস্তরী ইঞ্জিনীয়ার
আড়তদারও নন, দস্তরী তো
তাহলে শ্রীযুক্ত দস্তরী হন

সত্যি ধরা যাক। শ্রীযুক্ত
...ন, শ্রীযুক্ত মার্চেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার।
...স্তরী নন, ইঞ্জিনীয়ার নন,
... না, তাহলে শ্রীযুক্ত কনট্রাকটর

...ক্ষেত্রে কনট্রাকটর।
... হোন, শ্রীযুক্ত দস্তরী যে
...ছে।
...র,
... 'India' শব্দে দু-বারই I
... ইংরেজি বাক্য নির্ভুল।
...।

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো : তপন দাশ

গতবারে ছিল মাইক-এর ছবি

কিসের ছবি

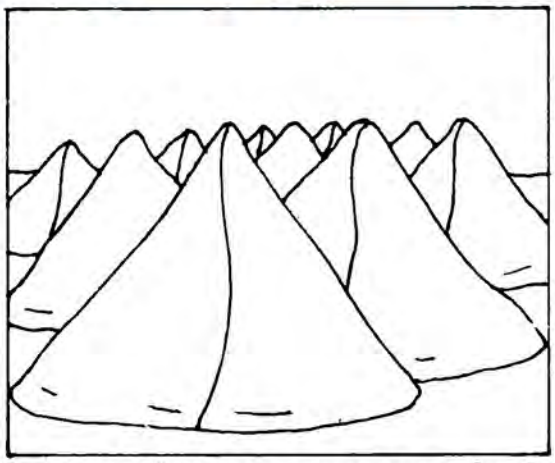

এবারের ছবি দেখে হয়ত মনে হচ্ছে—সারি-সারি পাহাড় বা তাঁবুর সারি। কিন্তু পাহাড়ের মাঝে মাঝে ওগুলো কিসের রেখা? আর, তাঁবু কি কখনও দড়ি ছাড়া বাঁধা যায়? তাঁবুর দড়ি তো এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে কী এগুলো? এবারের ছবিটার মধ্যে কিন্তু অনেক লোভ জড়িয়ে আছে। মিষ্টির দোকানে কাচের ভেতর দিয়ে লক্ষ করে দেখেছ কি সেখানে সারি-সারি মিষ্টি সিঙাড়া সাজানো থাকে? জিবে জল আসার আগেই ভাল করে লক্ষ করলে দেখবে, সিঙাড়ার মাঝখানে একটা ভাঁজের দাগ আছে। এগুলো ঝাল-সিঙাড়া নয় কেন জানো? ঝাল-সিঙাড়া থাকে ঝুড়িতে, ভাজার পরে ঝুড়িতে রেখে দেওয়া হয়। আর, মিষ্টি সিঙাড়া এইভাবে সারি দিয়ে সাজানো থাকে।

চিত্রপাল

১	২		■	৩		৪
■		■	৫	■	■	
৬		■		■	■	
■	■	৭			■	■
৮	■	■		■	৯	
	■	■		■		■
১০			■	১১		

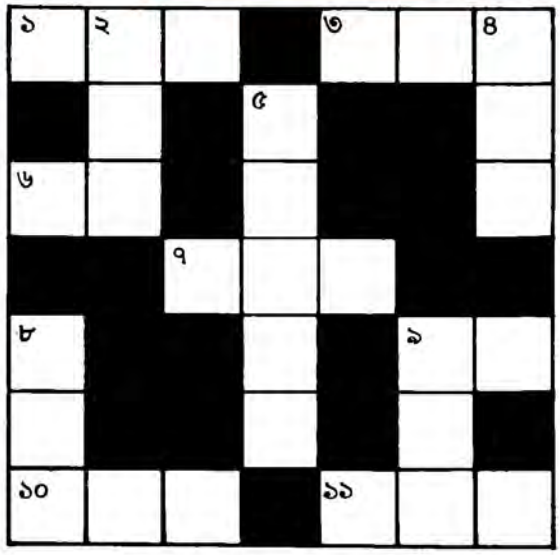

ফলফুল পশুপাখি ইতিহাস-ভূগোল নিয়ে তো অনেক হল—ভবিষ্যতেও হবে, মৎস্যসন্ধানও হয়ে গেছে, এবারে একটু সবজি-সন্ধান করলে কেমন হয়। যদি রাজি থাক, তরি-তরকারির নাম দিয়ে সংকেত-মাফিক পূরণ করো এবারের ছকটি।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) খেতে ভাল, কিন্তু তুলবে কে? (৩) কারো অপদার্থতা বোঝাতে এই আখ্যা দেওয়া হয়। (৬) কোন্ আনাজের নাম বিশেষ ধরনের নুন আর চিনির আগে বসে? (৭) কাঁচায় আনাজ পাকায় ফল। (৯) সুকুমার রায় তাঁর বিখ্যাত এক কবিতায় এটিকে পুড়িয়ে খেতে বলেছেন। (১০) অকালে ফললেই গালমন্দ। (১১) খোলসটি তারের বাজনা তৈরি করতে লাগে।

উপর-নীচে : (২) উলটে নাও, বাজার আলো করে রাখবে। (৪) সব তরকারিই বোঝায়। (৫) বড়ি, কেক আর মোরব্বা তৈরি করতে লাগে। (৮) খবর যদি খারাপ হয় তবেই দেখা মেলে। (৯) বড্ড তেতো, তবু খাওয়া উপকারী বইকী।

আগামী সংখ্যায় সমাধান

গতবারের সমাধান

			আ			
		বো	ম্বা	ই		
	শ্রী	■	লা	■	রো	
সু	রা	ট	■	পা	ট	না
	ট	■	আ	■	ক	
		সা	লে	ম		
			শ্রী			

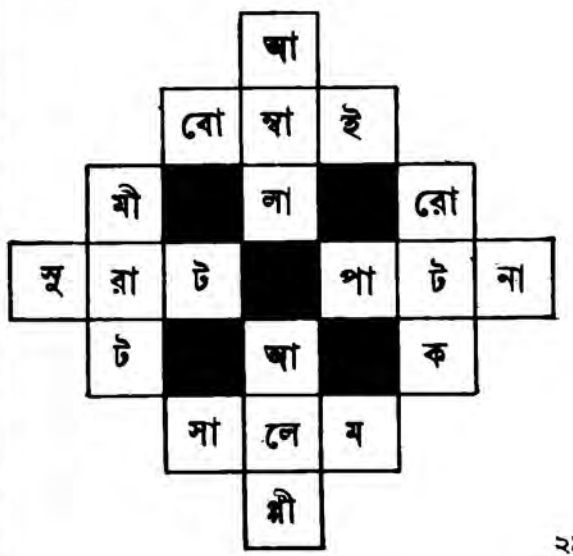

কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন?
ব্যাপার গুরুতর! আমার হুইস্কির বোতল বেপাত্তা।
বেপাত্তা? নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে রেখেছে। সে তোমার ভালই চায়।
ভাল চায়? তাকে ধরতে পারলে আমি ছাল ছাড়িয়ে নেব!
সকালবেলা খোঁজা যাবে। বড্ড ঘুম পেয়েছে। শুতে চললুম।

তুমি ঘুমোও! আমি জানি আমি কী করব!
NO ENTRY

OLD SCOTCH WHISKY
আরেব্বাস! হুইস্কির বাক্সে এটা আবার কী?
OLD SCOTCH WHISKY
NO ENTRY

ঠক...
ঠক....
ঠক
টিনটিন, টিনটিন, শিগগির এসো, ভয়ানক কাণ্ড.....
খোলের মধ্যে কে যেন একটা বোমা লুকিয়ে রেখেছে!

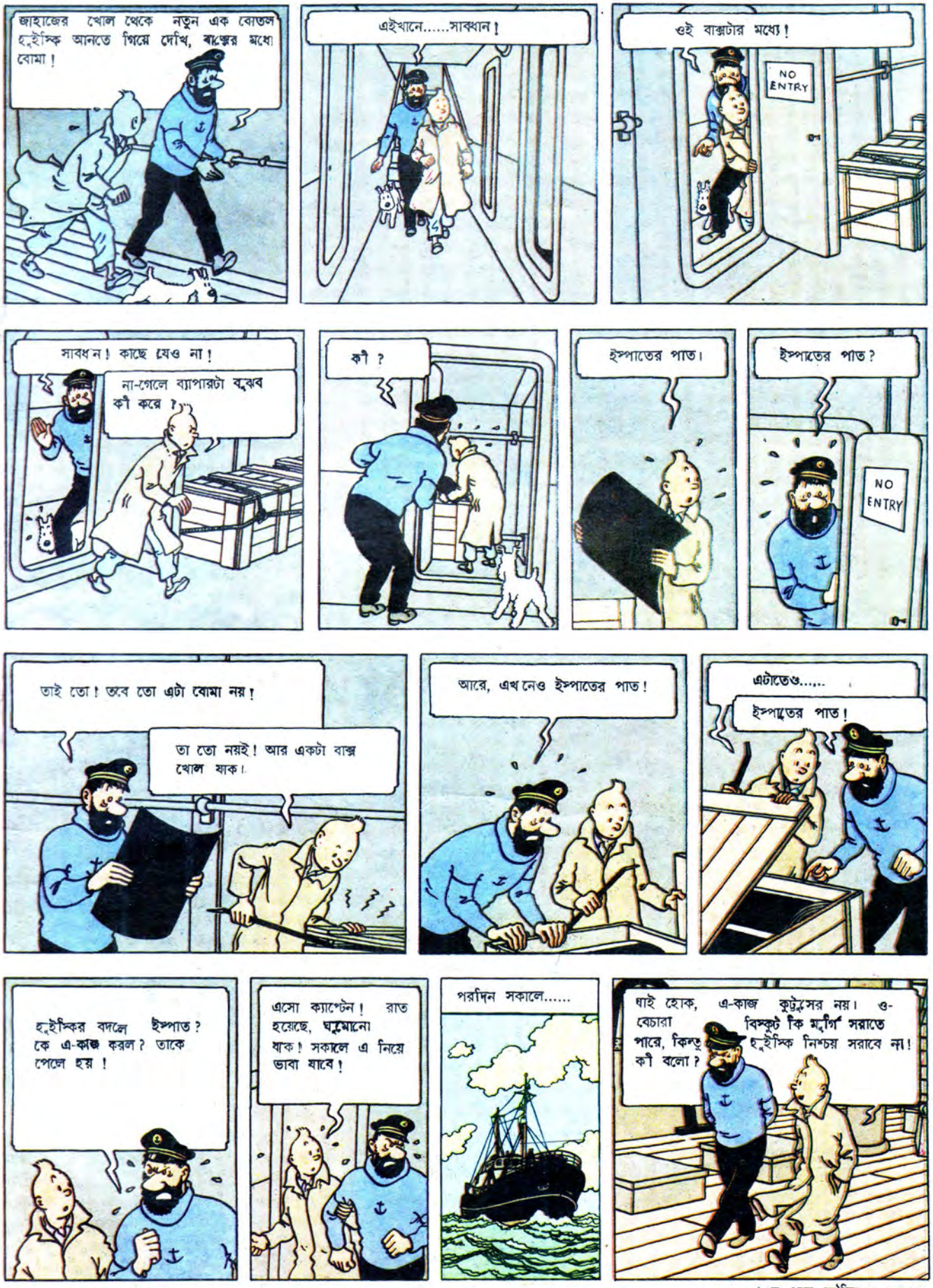

(এর পরে চৌত্রিশের পাতায়)

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের রেক্টর কী বলেন

কলকাতায় জেসুইট খ্রীস্টানদের পরিচালিত দুটি স্কুল আছে -সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল ও সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল। গত বছর ফাল্গুন সংখ্যায় সেন্ট লরেন্সের সম্পর্কে লিখেছিলাম। সেন্ট জেভিয়ার্সে গিয়ে দেখি পড়াশোনা ও স্কুল পরিচালনার ব্যবস্থা একেবারে এক। স্কুলের প্রধান হলেন একাধারে রেক্টর, হেডমাস্টার এবং প্রিফেক্ট অব স্টাডিজ। নিয়ম, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ব্যাপারের জন্যে প্রিফেক্ট অব ডিসিপ্লিন। সেন্ট লরেন্সের মতই সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা। তবে ২০—১৯ 'ভেরি গুড',১৮—১৬ 'স্যাটিসফ্যাকটরি', ১৫—১১ 'আনস্যাটিসফ্যাকটরি। আর ১০—৬ 'ব্যাড'। যথাক্রমে এ, বি, সি ও ডি গ্রেড। বিচার্য বিষয় সেই চারটিই—আচরণ, মনোযোগ, পড়াশোনা ও বাড়ির কাজ। বছরের গোড়াতেই স্কুল ক্যালেণ্ডার দেওয়া হয় ছাত্রদের। তাতে সারা বছরের সমস্ত স্কুল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ছকে দেওয়া আছে, তা থেকে একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এ-বছর বড়দিনের বন্ধের পর স্কুল খুলবে ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৯।

এ-স্কুলের পরীক্ষার ফল ভাল হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় গত দুবছরের মধ্যে একবারও ফেল বা থার্ড ডিভিশন নেই। তার আগে উচ্চ মাধ্যমিকেও ফল ভাল হয়েছে, তবে কোনও কোনও বার একটি কি দুটি থার্ড ডিভিশন হয়েছে।

প্রশ্ন রাখলাম স্কুলের রেক্টর তথা প্রধান শিক্ষক রেভারেণ্ড ফাদার এড্রিয়েন ওয়েভরেইল-এর কাছে। সব জায়গায় সমানভাবে ভাল ফল হয় না কেন?

উত্তরে তিনি দুঃখের সঙ্গে গ্রাম ও শহরে পরীক্ষার ফলের তারতম্যের কথা উল্লেখ করলেন। গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নানা অসুবিধা ও কষ্ট সম্পর্কে এত কথা এর আগে কাউকে বলতে শুনিনি। তাদের দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে যাওয়ার কষ্ট, বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা না-থাকার অসুবিধা ও সর্বোপরি গৃহপরিবেশের কথা বললেন। অনুভব করলাম, শুভ্র পোশাকে ঢাকা শ্বেতকায় যাজকটির অন্তঃকরণও কত নির্মল।

বেলজিয়াম থেকে পঁচিশ বছর আগে ভারতে এসে হাজারিবাগ, বাসন্তী এবং হলদিয়ার সেন্ট জেভিয়ার্সে শিক্ষকতার কাজ করে কলকাতার স্কুলে আসেন। হেডমাস্টার হয়েছেন গত বছরের ১০ জানুয়ারি। সেন্ট লরেন্স স্কুলে ফাদার ওয়েভরেইল গিয়েছিলেন ছাত্র হিসেবে। বাংলা শিখতে! বারবার বললেন যে, ওঁর বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লাস থ্রি-র ছাত্রের মত! কারণ সেন্ট লরেন্সে থ্রি-র বাংলা শিক্ষক ওঁকে শিখিয়েছিলেন! আসলে দরকার হলে উনি ভালই বাংলা বলতে পারেন, সে-কথা আমাকে বলে দিলেন সহকারী শিক্ষক শ্রীঅশোক সমাজপতি। শ্রীসমাজপতির কাছ থেকে আরও জানলাম যে, ফাদার ওয়েভেরেইল সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেরও রেক্টর।

বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার চাইতে সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনাটাই ফাদার ওয়েভরেইল-এর পছন্দ। সেই ভাবেই আমাদের কথাবার্তা চলল। বর্তমান পাঠ্যক্রম সম্পর্কে উনি মনে করেন, "নো প্যাটার্ন হ্যাজ অ্যাজ ইয়েট ইমার্জড্।" এর জন্যেই ছাত্রছাত্রীদের এক বিরাট অংশ দ্বিধাগ্রস্ত। যাই হোক, সামগ্রিক ভাবে সাফল্যের চাবিকাঠি চিরকালই এক। "দেয়ার ইজ নো সাবস্টিটিউট ফর হার্ড ওয়ার্ক," হেসে বললেন ফাদার ওয়েভরেইল। ওঁর মতে প্রতিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর উচিত প্রতিটি বিষয় তিনবার করে অভ্যাস করা। প্রথমবার সে বিষয়ের মূল পয়েণ্টগুলি বুঝতে পারে। দ্বিতীয়বারে আরও কতকগুলি নতুন পয়েণ্টের সাহায্যে বিষয়টিকে পুষ্ট করতে পারবে। তৃতীয়বার অভ্যাসের পরই সে বুঝতে পারবে বিষয়টির উপর তার কতটা দখল এসেছে এবং তখন সে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ পাবে।

ইংরেজির প্রশ্ন ওঠায় উনি বললেন যে, প্রতিদিন ইংরেজিতে নিজের ভাব প্রকাশ করায় উদ্যোগী হতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। চাই কম্পোজিশন এর অনুশীলন, টেক্সট-এর কাহিনীকে নিজের ভাষায় লেখা। বর্তমানে ইংরেজিতে যে সহজ অবজেকটিভ প্রশ্ন দেওয়া হয় তার সম্পর্কে ওঁর বক্তব্য যে, এগুলোর লক্ষ্য সীমায়িত—মূল্যায়নে সুবিধা করে। নম্বর তোলার ব্যাপারেও। কিন্তু ইংরেজি শিখতে এই পদ্ধতি সাহায্য করে না। সত্যি কথা বলতে গেলে ভাষা শেখার লক্ষ্যের সঙ্গে নম্বর তোলার লক্ষ্যের খানিকটা বিরোধ

রয়ে গেছে।

অঙ্ক সম্পর্কে ফাদার ওয়েভরেইলের বক্তব্য, অঙ্ককে আয়ত্তে আনতে হবে 'স্টেপ-বাই-স্টেপ' বুঝে। মুখস্থ করতে গেলে বোকামি হবে। যদি কোনও ছাত্র নীচের দিকেই অঙ্কের ভাল শিক্ষক পেয়ে যায়, তবে সেটা তার পক্ষে পরম সৌভাগ্য মনে করতে হবে, কারণ বীজগণিত, জ্যামিতি এসব তো গোড়ার দিকেই আরম্ভ হয়ে যায়। এই সময় উপযুক্ত চর্চা হলেই অঙ্কের ভয় দূর হয়ে যাবে।

ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়গুলির জন্যে ফাদার ওয়েভরেইল যথেষ্ট সংখ্যক রেফারেন্স বই, ম্যাপ, চার্ট, পিয়ার্স-জাতীয় এনসাইক্লোপিডিয়া, ইয়ার বুক, রীডার্স ডাইজেস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে বললেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক বই পড়ার চেয়ে প্রোজেক্ট করার উপর জোর দিলেন। এই সময় ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় সোমক রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমরা অঙ্ক ছাড়া আর সব কিছুতেই প্রোজেক্ট করেছি।"

ফাদার ওয়েভরেইলকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাল উত্তরের কী কী গুণ থাকা দরকার। বললেন, "ইট মাস্ট বি রেলেভ্যাণ্ট, ব্রিফ, অর্ডার্ড, অর্গ্যানাইজড।"

মাসিক আনন্দমেলা সম্পর্কে ফাদার ওয়েভরেইল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। ও'র মতে, স্বক্ষেত্রে আনন্দমেলা অপ্রতিদ্বন্দ্বী —কিশোর-কিশোরীদের জন্যে "দি বেস্ট ম্যাগাজিন! এক্সেলেণ্ট!"

এক সময় ঘরে এলেন প্রিফেক্ট অব ডিসিপ্লিন, রেভারেণ্ড ফাদার বুশে। ভেবেছিলাম, বর্তমান ছাত্র-অস্থিরতা সম্পর্কে উনি ক্ষোভে ফেটে পড়বেন। "কম্পেয়ার্ড টু হোয়াট আই হ্যাভ সীন ইন ইট ইজ প্যারাডাইস।" (বিদেশের কয়েকটি জায়গার উনি নাম করেছিলেন।) জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ কী। উনি বললেন, ইণ্ডিয়ায় এখনও ছেলেমেয়েদের উপর বাবা-মায়ের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

কী ভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

শতকরা ৮৬ নম্বর পেয়ে টেস্টে প্রথম স্থান পেয়েছে সোমক। বেশ ভাল নম্বর। ফাইনালের কথা জিজ্ঞেস করায় বলল, "আশা করি ভাল হবে, তবে বাকিটা ভাগ্যের হাতে।"

সোমকের বাবা শ্রীনক্ষত্রকুমার রায়-চৌধুরী কালীঘাট দেশবন্ধু কলেজের উপাধ্যক্ষ। যেটুকু পারেন সেটুকু সময় উনি ছেলের লেখাপড়ার জন্যে দেন। বাবার চেয়ে বেশি সময় দেন মা শ্রীমতী বন্দনা রায়চৌধুরী।

সোমক চায় প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে। এই উদ্দেশ্যেই ও সব বিষয়ে একাধিক বইয়ের সাহায্য নেয়। তারপর বিভিন্ন সূত্র থেকে—যেমন টেস্ট পেপার্স, পর্ষদ বার্তা—আদর্শ প্রশ্ন ঠিক করে তার উত্তর লেখে। লেখার উপর ও খুবই জোর দেয়। লেখার ফলে পয়েণ্টগুলো ওর মনে থাকে। লেখা উত্তরগুলো ও বাবা, মা ও শিক্ষকদের দেখিয়ে নেয়। সোমক যখন কোনও বিষয় পড়ে তখন ও "সমস্ত কিছুর কথা ভেবে" পড়ে। তাই ও সব সময়েই নিজে-নিজেই প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অবজেক-টিভ' প্রশ্নোত্তরগুলোও তৈরি করে নেয়।

সোমক প্রত্যেকটি বিষয়েই একাধিক ভাল বই পড়ে। যদিও ইংরেজি মিডি-য়ামেই পড়াশোনা করেছে এবং উত্তরও লেখে ইংরেজিতে, সমস্ত ভাল বাংলা বইগুলিই ও উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে।

সোমক ইংরেজি গ্রামারের জন্য পড়ে নেসফিল্ড, রেন-মার্টিন, রো-ওয়েব। বাংলা ব্যাকরণের জন্যে স্কুলে পড়ানো হয় ডঃ সুধীর দাশগুপ্তর 'বাণীদীপ'; এ-ছাড়া ও আরও পড়ে জগদীশ ঘোষ, ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং বামনদেব চক্রবর্তীর বইগুলি। সংস্কৃতে পাঠ্য বই কৃষ্ণগোপাল গোস্বামীর নবরূপে ব্যাকরণ-কৌমুদী ছাড়া 'হেল্পস্ টু দি স্টাডি' ও আর একটি ব্যাকরণকৌমুদী সোমক পড়ে। ভূগোলে ডঃ শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জীর বই দেওয়া আছে লিস্টে। ও আরও তিনটি বই খুব ভাল করে পড়ে, মণীন্দ্র ঘোষ—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়—চক্রবর্তী ও লাহিড়ী—ব্যানার্জী। এছাড়া, গুহ—শ্যাম এবং বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বই দুটি ও মাঝে মাঝে দেখে। ইতিহাসে স্কুলে পড়ানো হয় বসু—মৈত্র। এর উপর সোমক পড়ে ডি এন কুন্দ্রা, কিরণ চৌধুরী, ও এল মুখার্জীর বই তিনটি। ভিনসেণ্ট স্মিথ এবং ঈশ্বরীপ্রসাদ-এর বই দুটিও প্রয়োজনমত ব্যবহার করে।

অঙ্কে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ানো হয় কেশব নাগের বই দুটি। কিন্তু যাদব চক্রবর্তী, কে পি বসু, গাঙ্গুলী-মুখার্জী, হল-স্টিভন্স, দাস-মুখার্জী—এই সব ভাল ভাল বই সোমককে পড়তে হয়। কেশব নাগের লেখা হায়ার সেকেণ্ডারি সিলেবাসের বইও ওর খুব কাজে লাগে। ফিজিক্যাল সায়েন্সে ফিজিক্সের জন্যে পড়ে ডি পি রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, রায়চৌধুরী-সিনহা, বসু-চ্যাটার্জী। কেমিস্ট্রিতে ল্যাডলি মিত্র, পি কে দত্ত, বিজয়কালী গোস্বামী আর দু'টির জন্যেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর বইটি। স্কুলে নাইনে দাশ-গুপ্তর ও টেনে ব্যানার্জীর বই পাঠ্য।

সোমকের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় জীবন-বিজ্ঞানের জন্য স্কুলে দেওয়া আছে দেব অ্যাণ্ড পাল। ও অতিরিক্ত বই পড়ে ডঃ সুজয় গুপ্ত, কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, কার্তিক মণ্ডল, সরকার-বসাক। আর, এন সি ই আর টি-র "লাইফ—ইটস ফর্ম অ্যাণ্ড ফাংশনস" বইটির স্কেচগুলি ওকে মুগ্ধ করেছে।

সোমক মাসিক আনন্দমেলার শুধু পাঠক বা গ্রাহকমাত্র নয়। ভক্ত। প্রথম সংখ্যা থেকেই আনন্দমেলা নিচ্ছে। বাঁধিয়ে রাখছে। "মজার পড়া" বিভাগটি ওর সবচেয়ে প্রিয়। 'লেখাপড়া' ও পূজা সংখ্যার 'হেড এগজামিনারদের উপদেশ' এবং বিশেষ করে "শেষ মুহূর্তের পরামর্শ" ওর খুবই উপকারে এসেছে। "এবারেও যেন 'শেষ মুহূর্তের পরামর্শ' থাকে আনন্দমেলায়"—সোমক দাবি জানাল।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ফোটো তপন দাশ ৩৩

(একত্রিশের পাতার পর)

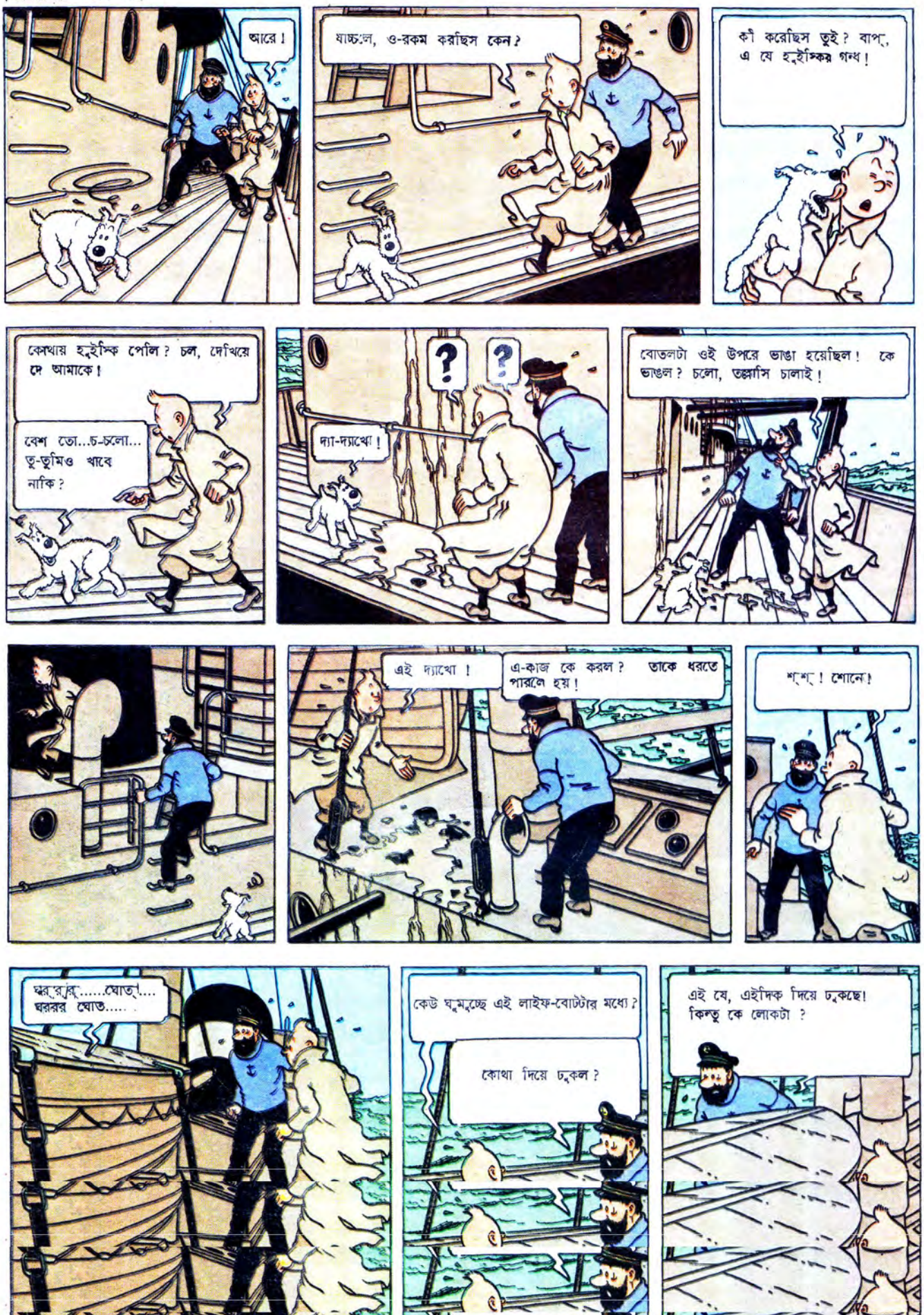

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বাংলা বনাম পাঞ্জাব। সুরজিৎ সিং বল ধরছেন।

পাঞ্জাবকে বিধ্বস্ত করে বাংলা জিতল

পুষ্পেন সরকার

শনিবার। ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। বেলা বারোটা থেকে কাতারে-কাতারে মানুষ চলেছে মোহনবাগান মাঠের দিকে। সবার মুখে এক কথা। বাংলা কি হারাতে পারবে পাঞ্জাবকে? আগের তিন-চারটে খেলায় ভাল খেলতে পারেনি বাংলা।

পাঞ্জাব চমৎকার খেলেছে। ইন্দর সিং ও হরজিন্দর সিংকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা। এগারোজন খেলোয়াড়ের সমান টগবগে স্বাস্থ্য। যেমন তারা মাথায় উঁচু, তেমনি শক্তি। বিদেশের মত ছোটখাটো চেহারার আর সুরজিতের মত লিকলিকে শরীরের খেলোয়াড় কি পারবে ঐ সব তাগড়া জোয়ানদের টপ্‌কে গোল করতে? কারও মুখে হাসি নেই।

শনিবার বিকেল পাঁচটা। খেলার শেষে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছে জনস্রোত। একটা কথাই সকলের মুখে। এত ভাল খেলেও বাংলা একটা গোল দিতে পারল না? এ-সুযোগ কি আর আসবে? শেষে কি কূলে এসে তরী ডুববে?

রবিবার। ৫ই ফেব্রুয়ারি। বেলা এগারোটা থেকে মানুষের মিছিল চলেছে আবার সেই মোহনবাগান মাঠের পথে। ঠোঁটে কারও হাসি নেই। দুশ্চিন্তায় থমথম করছে সকলের মুখ। অনেকের খাওয়া হয়নি। মনে শান্তি না থাকলে কি ভাত গলা দিয়ে নামে? পাঞ্জাব আবার নিজের শক্তি বাড়াতে নতুন তিনজন খেলোয়াড়কে আনিয়েছে।

মাঠের ইলেকট্রিক ঘড়িতে দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ। রেফারি লেনা ডি'সা খেলা শুরুর বাঁশি বাজালেন। মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। উত্তেজনায় অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। তেইশ মিনিটে শ্যাম থাপা হেড দিয়ে গোল করলেন। সারা মাঠ নাচতে থাকল। চিৎকারে পাশের লোকের কথাও শোনা যায় না।

দশ বারো মিনিট পার হতে-না-হতেই মাঠ একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ আছে বোঝার উপায় নেই। অনেকের চোখে জল। দিলীপ পালিত আত্মঘাতী গোল করে মাঠে উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা ঠুকছেন। বাংলার খেলোয়াড়রা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

দু-চার সেকেণ্ডের মধ্যে অবস্থা সামলে নিলেন বাংলার খেলোয়াড়রা। প্রদীপ চৌধুরী গিয়ে দিলীপের হাত ধরে টেনে তুললেন। পিঠ চাপড়ে দিলেন। চোখে-চোখে ছড়িয়ে গেল প্রতিজ্ঞা। বিদেশ গোল করলেন। আবার এগিয়ে গেল বাংলা ২—১। শেষ বাঁশি বাজার আগেই সুরজিৎ নিশ্চিন্ত করলেন দর্শকদের ৩—১।

গ্যালারিতে জ্বলে উঠল কাগজের মশাল। আনন্দে নাচতে থাকল ছেলে, বুড়ো সকলে। নাচ আর থামতে চায় না। যার গলা ভেঙে গেছে সেও চিৎকার করছে। আবিরে মাখামাখি সকলের মুখ। খেলার ধারা-বিবরণ দিচ্ছিলাম। এক দল ছেলে এসে অনুরোধ জানালেন, পুষ্পেনদা, মাথাটা একটু বাড়িয়ে দিন। বাড়িয়ে দিলাম। আমার কপালেও আবির মাখালেন অনেকে। ভালবাসার উপহার। বাংলার ঘরে-ঘরে তখন আনন্দের জোয়ার বইছে।

আবার সন্তোষ ট্রফি জিতল বাংলা। মোট সতেরো বার পেল। পরপর তিন বছর। আগেও একবার পরপর তিনবার জাতীয় ফুটবলে বিজয়ীর মুকুট পেয়েছিল বাংলা। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সালে। দুবার জয়ের হ্যাটট্রিক। অন্য কোন রাজ্য একবারও এ-

সম্মান পায়নি। তাছাড়া সতেরোবার জয়। অন্য রাজ্যগুলির কাছে আজও স্বপ্নের মত।

ফাইনালে দারুণ খেলেছে বাংলা। প্রথম দিনের ফাইনালে ভাল খেলেও পাঞ্জাবকে হারাতে পারেনি। গোল করতে পারেনি কোন দল। খেলার ধারা অনুযায়ী বাংলারই সেদিন জেতা উচিত ছিল।

দ্বিতীয় দিনের ফাইনালের শুরু থেকেই বাংলার খেলোয়াড়রা জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে খেলতে থাকেন। পাঞ্জাব অধিকাংশ সময় কোণঠাসা হয়ে ঘর সামলায়। সুরজিৎ সেনগুপ্ত আর বিদেশ বসু দুই আউটকে আটকানো পাঞ্জাবের খেলোয়াড়দের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে পড়ে। ছোটখাটো বিদেশ বিদ্যুৎগতিতে ভেঙে ফেলতে থাকেন পাঞ্জাবের শক্ত রক্ষণভাগ। মনে হতে থাকে, যেন একটা চিতাবাঘ ছুটে বেড়াচ্ছে শিকারের খোঁজে। আর সুরজিৎ শিল্পী। বল নিয়ে ডান-পায়ে বাঁ-পায়ে ছোট-ছোট টানে ছিটকে দিতে থাকেন পাঞ্জাবের দীর্ঘকায় খেলোয়াড়দের। কোথায়, কখন সুরজিৎ, বুঝতে পারেন না বিপক্ষের খেলোয়াড়রা। বাংলার আক্রমণ ছত্রখান করে দেয় পাঞ্জাবের রক্ষণব্যূহকে।

সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী আর চিন্ময় চ্যাটার্জি মরিয়া হয়ে রুখে দেন পাঞ্জাবের দুই নামী খেলোয়াড় ইন্দর সিং আর হরজিন্দর সিংকে। সতর্ক পাহারার দায়িত্ব নেন দুই হাফব্যাক প্রসুন ব্যানার্জি ও গৌতম সরকার। রক্ষণ কাজ ছাড়াও আক্রমণের রসদ জোগাতে ভুল করেন না তাঁরা। দলের এগারোজন খেলোয়াড় মিলে-মিশে এক হয়ে যান। সকলের এক পণ। বাংলা থেকে সন্তোষ ট্রফি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না।

আগেও পাঁচবার জাতীয় ফুটবলের খেলা হয়েছে এখানে। প্রতিবারই বাংলা জিতেছে। সেই ঐতিহ্যের পতাকা এবারও অমলিন থেকেছে সমবেত চেষ্টায়। দ্বিতীয় দিনের ফাইনালের পর পাঞ্জাবের অধিনায়ক মুক্ত কণ্ঠে আমার কাছে স্বীকার করেন ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের কথা। তিনি বলেন, "সব বিভাগেই বাংলা আমাদের থেকে ভাল খেলেছে। যোগ্য দল হিসাবে জয়ীর সম্মান বাংলারই প্রাপ্য।"

ফাইনালে বাংলা ভাল খেললেও কোয়ার্টার ফাইনালে এবং সেমিফাইনালে সুনামের সঙ্গে খেলতে পারেনি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'রাইজিং টু দি অকেশন'। প্রয়োজনের মুহূর্তে শক্ত হয়ে দাঁড়ানো। সাহসের সঙ্গে উন্নত সংগ্রাম করা। বাংলার প্রতিটি খেলোয়াড় সেই কাজ করেছেন। ফলে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ১—৩ গোলে পাঞ্জাব দল হেরেছেন বটে, কিন্তু এই পরাজয় তাঁদের পক্ষে বিন্দুমাত্র অগৌরবের হয়নি। বাংলার দর্শক ও সমর্থকদের প্রচুর প্রশংসা পেয়ে গেছেন পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রাণপণ চেষ্টা করেছে গোল শোধ করার জন্য।

অধিনায়ক ইন্দর সিং একজন জাত খেলোয়াড়। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর বয়স। অথচ আজও তরুণ। অফুরন্ত দম। দলের আক্রমণ রচনায় অধিকাংশ সময় মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন। বিপক্ষের গোলের সামনে বল পেলে নির্ভুলভাবে লক্ষ্য ভেদ করতে পারেন। দুপায়ে সমান শট। ইন্দর সিং এখনও ভারতের শ্রেষ্ঠ স্ট্রাইকার।

আর এক স্ট্রাইকার হরজিন্দর সিং। বয়সে তরুণ। ছিপ্‌ছিপে সুন্দর চেহারা। পরিচ্ছন্ন খেলা। প্রতিটি বল দেন দেখে-শুনে। বুদ্ধি খাটিয়ে। সময় মত ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ান। বাঁ পায়ে বলের ভেল্কি দেখাতে পারেন। অধিনায়ক ইন্দর সিংয়ের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া। পাঞ্জাবের আক্রমণের দুই ধারালো ফলা হলেন ইন্দর ও হরজিন্দর। রক্ষণভাগে দুই স্টপার গুরদেব সিং ও পারমারও যেন দুটি অটল স্তম্ভ।

বাংলা বনাম রেলওয়েজ। আকবর হেড করেছেন। এদিক শ্যাম থাপা।

ফাইনাল। বলের দখল কাড়বার চেষ্টা চলছে।

অনেকের ধারণা ছিল পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা শুধু শক্তি দিয়ে খেলেন। বুদ্ধি এবং কৌশলের ঘাটতি আছে। সে ভুল ভেঙে দিয়ে গিয়েছেন পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল শেষ হবার পর বাংলার কোচ অরুণ ঘোষ আমায় বলেছিলেন, "পাঞ্জাব আমাদের সঙ্গে সমান তালে লড়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের গতি এবং বলের উপর দখল রাখার ক্ষমতার কাছে ওরা কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও কোন সময়েই বাংলাকে খেলা ছেড়ে দেয়নি। লড়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। পাঞ্জাবের পরাজয়ে বিন্দুমাত্র অগৌরব নেই।"

এবারের প্রতিযোগিতায় চব্বিশটি দল যোগ দিয়েছিল। এই চব্বিশটি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। এ গ্রুপে বাংলা, হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাট। বি গ্রুপে পাঞ্জাব, ওড়িশা ও পন্ডিচেরি। সি গ্রুপে কর্নাটক, মণিপুর ও হরিয়ানা। ডি গ্রুপে তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর এবং সার্ভিসেস। ই গ্রুপে মহারাষ্ট্র বিহার ও রাজস্থান। এফ গ্রুপে রেলওয়েজ, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম। জি গ্রুপে অনধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও গোয়া, এইচ গ্রুপে কেরল, নাগাল্যান্ড ও উত্তরপ্রদেশ। দিল্লি যোগ দেয়নি। গ্রুপের খেলাগুলি হয়েছে লীগ প্রথায়।

বাংলা ১১—০ গোলে গুজরাটকে এবং ৯—০ গোলে হিমাচল প্রদেশকে হারিয়ে এ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। গ্রুপ লীগে ২০টি গোল অন্য কোন দলই দিতে পারেনি। বি গ্রুপে পাঞ্জাব, সি গ্রুপে কর্নাটক, ডি গ্রুপে সার্ভিসেস, ই গ্রুপে বিহার, এফ গ্রুপে রেলওয়েজ, জি গ্রুপে অনধ্র এবং এইচ গ্রুপে কেরল চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায়।

কোয়ার্টার ফাইনালে আটটি গ্রুপ চ্যাম্পিয়নকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এক নম্বর গ্রুপে বাংলা, পাঞ্জাব, কর্নাটক ও সার্ভিসেস এবং দুই নম্বর গ্রুপে বিহার, রেলওয়েজ, অনধ্র ও কেরল আবার লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

কেরল বনাম পাঞ্জাব। হরজিন্দার বল নিয়ে এগোচ্ছেন।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে বাংলা ৩—০ গোলে সার্ভিসেসকে ৩·৩—০ গোলে কর্নাটককে হারিয়ে এবং পাঞ্জাবের সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র করে এক নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। কর্নাটকের সঙ্গে এবং বাংলার সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র এবং সার্ভিসেসকে ১—০ গোলে হারিয়ে পাঞ্জাব সেমিফাইনালে খেলার অধিকার অর্জন করে।

দুই নম্বর গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় কেরল। রানার্সের সম্মান পায় রেলওয়েজ। কেরল ২—০ গোলে অনধ্রকে, ৩—১ গোলে বিহারকে হারালেও রেলওয়েজের সঙ্গে ০—০ গোলে ড্র করে। রেলওয়েজ তিনটি খেলার মধ্যে একটিতে জেতে। অনধ্রের বিরুদ্ধে ৫—০ গোলে। বিহার ও কেরলের বিরুদ্ধে খেলা দুটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

সেমিফাইনালের মীমাংসা হয় দুটি করে খেলার মাধ্যমে। এক নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন খেলে দুনম্বর গ্রুপ রানার্সের বিরুদ্ধে। আর দু নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন খেলে এক নম্বর গ্রুপ রানার্সের সঙ্গে। অর্থাৎ বাংলা ও রেলওয়েজের মধ্যে এবং পাঞ্জাব ও কেরলের মধ্যে ফাইনালে ওঠার লড়াই হয়। বাংলা দুটি খেলাতেই রেলওয়েজকে ১—০ গোলে হারিয়ে ছাব্বিশ বার সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলার গৌরব অর্জন করে। অন্যদিকে পাঞ্জাব ৪—৩ এবং ২—১ গোলে কেরলকে পরাজিত করে তৃতীয়বার ফাইনালে খেলার সুযোগ পায়। বাংলা ও পাঞ্জাবের ফাইনাল খেলার কথা আগেই বলেছি। প্রতিযোগিতায় সব থেকে বেশি গোল করেছে বাংলা। ৩২টি। গোল খেয়েছে মাত্র দুটি।

এবারের প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার মধ্যে আমার ভাল লেগেছে তিনটি খেলা। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল, পাঞ্জাব—কেরলের প্রথম সেমিফাইনাল এবং গ্রুপ লীগে বিহার ও মহারাষ্ট্রের খেলা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি খেলাই ছিল

উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ভরা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শকরা অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে খেলা দেখেছেন শেষ ফল জানার জন্য। এ-জাতীয় খেলা দেখার সুযোগ কম মেলে।

দলগত শক্তির বিচারে বাংলা ও পাঞ্জাবের পরেই কেরলের নাম করতে হয়। উন্নত ফুটবল খেলেছে কেরল প্রতিটি খেলায়। এবারের প্রতিযোগিতায় দর্শকদের খুবই প্রিয় দল ছিল কেরল। গ্রুপ লীগে, কোয়ার্টার ফাইনালে এবং সেমিফাইনালে কেরলের খেলা দেখে সকলেই আশা করেছিলেন কেরল সেমিফাইনালে পাঞ্জাবকে হারিয়ে ফাইনালে যাবে। দুদিনই এক গোলের ব্যবধানে হেরে যায় কেরল। তবে পাঞ্জাবকে দুদিনই জেতার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। দলের দুই স্টপার প্রসন্নন ও বিজয়ন খুব নির্ভরযোগ্য। রাইট ব্যাক প্রেমনাথ ফিলিপ রক্ষণ ছাড়া প্রয়োজনে পঞ্চম ফরোয়ার্ড হিসাবে দলকে সাহায্য করেন। ফরোয়ার্ডে নাজিব শ্রেষ্ঠ। দলের ফরোয়ার্ড লাইনকে পরিচালনা করেন নাজিব।

রেলওয়েজ এবং সার্ভিসেসও ভাল ফুটবল খেলেছে। দুটি দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের কলকাতায় খেলার অভিজ্ঞতা আছে। রেলের নজন খেলোয়াড় ছিলেন ইস্টার্ন রেল, বি এন আর এবং পোর্টট্রাস্টের। সার্ভিসেস দলেও কলকাতার ইস্টার্ন কম্যান্ডের খেলোয়াড়রই ছিলেন বেশি। রেলের গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষ, রক্ষণভাগে বিপ্লব মজুমদার, অশোক চক্রবর্তী এবং রবীন দাস ছাড়া পুরোভাগে অশোক চন্দ ও বীরবাবু প্রায় প্রতিটি খেলাতেই নিজেদের দক্ষতা দেখান। সার্ভিসেস দলের রক্ষণভাগ ছিল শক্তিশালী। পুরোভাগে সোনেওয়াল, সি বি থাপা এবং অধিনায়ক সুব্রহ্মণ্যম সুনামের সঙ্গে খেলেছেন।

এদের পরেই আসে বিহার, কর্নাটক এবং অন্ধ্রের নাম। বিহারের রক্ষণভাগ আত্মবিশ্বাসী। দুই স্টপার লালন দুবে ও এ কুন্ডু এবং লেফট ব্যাক সুভাষ মুখার্জি ভবিষ্যতে আরও নাম করবেন। রক্ষণভাগের তুলনায় ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়দের দক্ষতা কম। অন্ধ্রের লেফট হাফ এডওয়ার্ড এবং কর্নাটকের লেফট ব্যাক মুস্তাফা ও রাইট হাফ দেবরাজ কুশলী খেলোয়াড়।

গতবারের রানার্স আপ মহারাষ্ট্র এবং শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচিত গোয়ার গ্রুপ লীগ থেকে বিদায় অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। এবার দুটি দলই দুর্বল। নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের প্রথম খেলা দেখে মনে হয়েছিল এবার জাতীয় ফুটবলে এরা আলোড়ন তুলবে। কিন্তু একটি খেলার পরই ওদের প্রতিভা ম্লান হয়ে গেল। ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ দলের খেলোয়াড়দের বুদ্ধি ও পায়ের কাজ আছে। মধ্যপ্রদেশের খেলা গতবারের থেকে উন্নত হয়েছে। তামিলনাড়ু দলগত খেলায় এখনও পিছিয়ে আছে। তবে নাইজেরিয়ার অধিবাসী মাদ্রাজে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ডেভিড উইলিয়ামসের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। লেফট স্ট্রাইকার হিসাবে ডেভিড একজন উঁচু দরের খেলোয়াড়।

প্রায় একমাস ধরে ফুটবলের দুর্গোৎসব চলল কলকাতায়। ভারতের সকল রাজ্যের কুশলী খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ এসেছিল চব্বিশ বছর পর। সাধ মিটিয়ে খেলা দেখেছেন দর্শকরা।

এবারে জাতীয় ফুটবল পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে গেছেন সকলে। কলকাতার দর্শকরা যে ফুটবলের সমঝদার, সে-কথাও স্বীকার করেছেন সকলে। যাঁরা ভাল খেলেছেন, তাঁদের প্রশংসা করেছেন দর্শকরা।

কথা আছে শেষ ভাল যার, সব ভাল তার। বাংলার জয়ে সেই শেষ ভালটুকুর আনন্দও প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন সকলে। জাতীয় ফুটবলের আসর আবার কবে কলকাতায় বসবে সেই আশায় অধীর আগ্রহ নিয়ে সবাই অপেক্ষা করবেন।

ফোটো তপন দাশ

ঝিদেশ বসু

দিলীপ পালিত

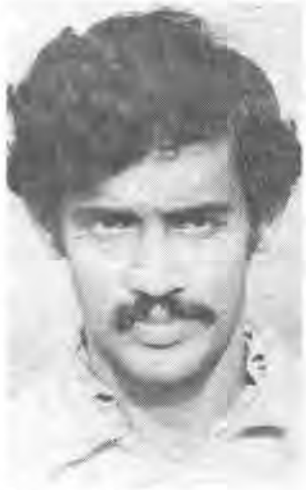

চিন্ময় চ্যাটার্জি

গৌতম সরকার

নাজিব

পায়াস

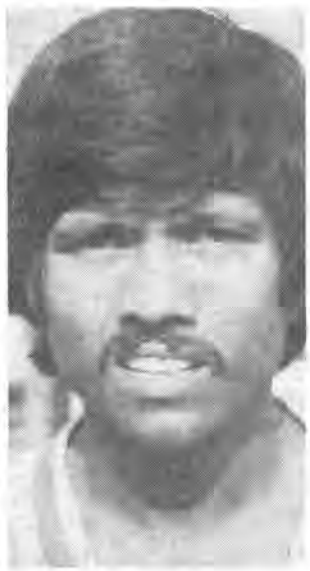

বাংলাকে কীভাবে কোচ করেছি

অরুণ ঘোষ

এ-বছর সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার নামমাত্র সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। আগে কলকাতায় যে পাঁচ-বার সন্তোষ ট্রফির খেলা হয়েছে সেই পাঁচবারই বাংলা জয়ী হয়েছিল। সেই ঐতিহ্য বজায় রাখার একটা গুরু দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ে। যদি ১৫ দিন সমস্ত খেলোয়াড়দের এক সঙ্গে পেতাম, তাহলে আমাকে এত উদ্বিগ্ন হতে হত না। কিন্তু সকলকে এক সাথে পেয়েছিলাম মাত্র তিনদিন।

এবারে বাংলা দলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় ছিল বেশি। ডুরাণ্ড ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকায় ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ানের খেলোয়াড়দের আমি পাই ২রা জানুয়ারি। মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা অনুশীলনে আসেন ৩রা জানুয়ারি। বাংলার দুজন খুব নামী খেলোয়াড় আসেন ৭ই জানুয়ারি। প্রতিযোগিতার ঠিক তিনদিন আগে। সন্তোষ ট্রফি কোন একটা বিশেষ দলের প্রতিযোগিতা নয়। রাজ্যের বাছাই খেলোয়াড়রা আসে খেলতে। দীর্ঘ অনুশীলন এবং প্রস্তুতির পর জাতীয় ফুটবল আসরে শক্তি পরীক্ষায় নামে।

বাংলায় কুশলী খেলোয়াড়ের অভাব নেই। কিন্তু গত সাত আট মাস ক্রমাগত ফুটবল খেলে সকলেই ক্লান্ত। খেলোয়াড়রা যত প্রতিভাবান হোক না কেন, তারা নানা দলের। ফুটবল তো একার খেলা নয়। দলের খেলা! পরস্পরের বোঝাপড়ায় গড়ে ওঠে শক্তি। বোঝাপড়া যত নির্ভুল হয়, দলের শক্তি হয়ে ওঠে তত ক্ষুরধার।

গ্রুপ লীগের প্রথম দুটি খেলায় আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশ। অনেক দুর্বল। বাংলার খেলোয়াড়-দের বিশেষ গা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে পাঞ্জাব সার্ভিসেস এবং কর্নাটক—তিনটি দলই বেশ শক্তিশালী। প্রত্যেক দলেই বেশ কিছু কুশলী খেলোয়াড় ছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালের দুটি খেলার পর আমি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি।

ফুটবলে সন্তোষ ট্রফি সব থেকে বড় প্রতিযোগিতা। তোমরা সবাই জানো। খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকলে ভাল খেলতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে বাংলার খেলোয়াড়দের যাচাই করা প্রয়োজন মনে করি। এর ফল উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। শ্যামল ব্যানার্জি এবং শ্যামল ঘোষ দুজনেরই পায়ের পেশীতে টান ধরে। ওরা প্রতিযোগিতার অধিকাংশ খেলায় যোগ দিতে পারেনি।

সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করি। বুঝতে পারি ক্রমাগত ফুটবলে সকলেই ক্লান্ত। শরীরের উপর বেশি চাপ না দিয়ে বোঝাপড়া বাড়ানো, আক্রমণের কৌশল, কখন বল ছাড়তে হবে, কী করে বিপক্ষের জমিতে ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করতে হবে এবং কখন কী ভাবে আক্রমণ করতে হবে, এই বিষয়গুলি মাঠের মধ্যে এবং বাইরে ক্লাস নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি।

এই শিক্ষার জন্য যে সময় দরকার, সেটা আমার হাতে ছিল না। এর উপর বোঝার উপর শাকের আঁটি যাকে বলে, তাই হল। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে বিদেশ ও সুরজিৎ অসুস্থ। শ্যামের পায়ের ক্যাফ মাসলে ব্যথা। প্রদীপের ডান দিকের কপালে আঘাত। আর আকবর তো প্রতিযোগিতার প্রথম থেকে শেষ অবধি পেটের গণ্ডগোলে ভুগছে।

ফুটবলে শারীরিক প্রস্তুতি যেমন দরকার, ঠিক তেমনি প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতিরও। খেলা একটা শিল্প। খেলায় শিল্পী হতে গেলে মনকে অন্য চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে হয়। না হলে খেলায় পারদর্শিতা দেখানো যায় না। মাঠ, দর্শক, আবহাওয়া খেলোয়াড়দের অনুকূল ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে বাংলার খেলা ভাল না হওয়ায় দর্শকদের প্রচুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খেলোয়াড়দের মনে কিছুটা হতাশা এনে দিয়েছিল। আমি উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে ওদের মনে শক্তি ফিরিয়ে আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করি।

প্রত্যেক খেলোয়াড়ের যেমন নিজস্ব একটা খেলার ভঙ্গিমা আছে, তেমনি প্রত্যেক দলেরও আছে খেলার একটা বিশেষ রীতি। আমি এর কোনটাই পরিবর্তনের চেষ্টা করিনি।

বাংলা আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে অভ্যস্ত। আক্রমণের প্রধান দুই অস্ত্র দুই উইং। বিপক্ষের দুই ব্যাককে আক্রমণ সামাল দেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়। আমি আমার দুই সাইড ব্যাককে সুযোগ মত আক্রমণে অংশ নিতে বলি। বিপক্ষের দুই ব্যাক যখন আমার দুই উইং নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন আমার দুই ব্যাকের আক্রমণে বিপক্ষের দুটি ব্যাককে জায়গা ছেড়ে আসতে বাধ্য করবে। ফলে ফাঁকা জমির সৃষ্টি হবে। এবং ঐ ফাঁকা জায়গা দিয়েই গোলের পথ তৈরি করবে আমার ফরোয়ার্ডরা।

ফাইনাল খেলার আগে আমি আমার খেলোয়াড়দের মনের দুর্বলতা ও জড়তা থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম। এটা আমার সব থেকে বড় সাফল্য। ওরা সকলেই আমাকে ভালবাসে। গুরুর মত সম্মান করে।

বাংলার জয় আমার জন্য আসেনি। খেলোয়াড়দের বলের উপর অপূর্ব দখল, তীব্র গতি, সুন্দর বোঝাপড়া এবং সমবেত চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। সমস্ত ভয়-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে, ওরা সকলেই বাংলার ফুটবল-সম্মান উঁচু করার জন্য মন-প্রাণ দিয়ে লড়েছে। তাই সম্ভব হয়েছে বাংলার জয়। মাঠে এবং মাঠের বাইরে আমাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ফোটো তপন দাশ

ইন্দর কী বলে গেলেন

শ্যামসুন্দর ঘোষ

"পাঞ্জাব থেকে রওনা হবার আগে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বাংলার মাঠ থেকে বাংলার দেওয়া সন্তোষ ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরব। কিন্তু আজ আমাদের ফিরতে হচ্ছে শূন্য-হাতে।" কথাগুলি যদিও পাঞ্জাবের অধিনায়ক ইন্দরের, তবু পাঞ্জাবের খেলোয়াড়দের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, এটা যেন তাঁদের সকলেরই কথা। হাওড়া স্টেশনে অমৃতসর মেল গাড়ির কামরায় পাঞ্জাব দলের খেলোয়াড়দের চোখে-মুখে যেন হতাশার ভাবই লক্ষ করেছি। ইন্দর তখন অবশ্য একের পর এক শুভানুধ্যায়ীদের বাড়ানো কাগজে স্বাক্ষর করে চলেছেন।

বাংলা-পাঞ্জাবের ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে ইন্দরকে কথা দিয়েছিলাম, ওঁদের ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। তাই হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম পাঞ্জাব দলকে বিদায় জানাতে। কামরার মধ্যে আমাকে দেখেই ইন্দর উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

বাংলার কাছে পরাজয়ে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়েরা যে মনে দারুণ আঘাত পেয়েছেন, তা তাঁদের চোখে-মুখেই প্রকাশ পাচ্ছিল। ইন্দর অবশ্য ফাইনাল খেলার প্রথম দিনের শেষেই বুঝেছিলেন এ-খেলায় জেতা অসম্ভব। জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" উত্তরে ইন্দর বললেন, "দাদা, বাংলার সঙ্গে গ্রুপ লীগের খেলায় আমরা যখন নিজেদের ভুলে গোল খেয়ে বসলাম, তখন আমি লক্ষ করে যাচ্ছিলাম যে, এই গোলের ফলে বাংলার ছেলেরা স্নায়ুর চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে কিনা। দেখলাম, না, বাংলার ছেলেরা পায়ে বল রাখতে ভয় পাচ্ছে। তখনই বুঝলাম, এ-খেলায় আমরা পরাজিত হচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত তাই হল। খেলার ফলাফল হল ১-১। কিন্তু ফাইনাল খেলার প্রথম দিন বাংলার ছেলেদের অন্য মূর্তি দেখলাম। যদিও আমরা ঐ খেলায় কোন গোল খাইনি, তবু বুঝতে পারলাম, বাংলার ছেলেরা স্নায়ুর চাপ কাটিয়ে উঠেছে। আসলে আমাদের ছেলেদের চেয়ে বাংলার ছেলেদের পায়ের কাজ অনেক ভাল। ওদের অভাব হচ্ছে দমের। তবে সাম্প্রতিককালে ডুরান্ড কাপে আমরা বাংলার ছেলেদের একাধিকবার পরাজিত করেছি। হ্যাঁ, কপাল ভাল থাকলে এ-খেলায় আমরা জয়লাভও করতে পারতাম।" কথাটা বলে ইন্দর কপালে হাত ঠেকালেন, তারপর বললেন, "হরজিন্দরের শট যদি ক্রসবারে না লেগে গোলে প্রবেশ করত, তাহলে হয়ত ট্রফি নিয়েই ঘরে ফিরতাম।"

"তুমি কি মনে করো না যে, যোগ্য দল হিসাবেই বাংলা জয়ী হয়েছে?"

"নিশ্চয়ই। বাংলার ছেলেরা শেষের দিকে যেভাবে খেলছিল, বিশেষ করে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, তাতে আমাদের আরও বেশি গোলে পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল। তবে একটা কথা বলি, বাংলার ছেলেরা শুটিংয়ে খুব পুওর।"

এই সময় পাঞ্জাব দলের প্রশিক্ষক বললেন, "দাদা, এখানে তো চার মাস লীগ খেলার ব্যবস্থা, তার উপরে আছে অনুশীলন পর্ব। আর আমাদের ওখানে কোন লীগ খেলা হয় না। আমরা সারা বছর কয়েকটি নক আউটই খেলি।"

কলকাতার দর্শকদের কেমন লাগল? ইন্দর উত্তর দেওয়ার

ইন্দর

গুরদেব

আগেই পাঞ্জাবের কয়েকজন খেলোয়াড় বলে বসলেন, "এই রকম উগ্র সমর্থক আমরা কোথাও দেখিনি।" ইন্দর অবশ্য বাধা দিলেন। বললেন, "খেলোয়াড়েরা যখন খেলেন, তখন দর্শকরা কী বললেন বা বলছেন, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে না। এটা স্বাভাবিক, দর্শকরা ঘরের দলকেই সমর্থন করবে। তবে কলকাতা ভারতের ফুটবল-কেন্দ্র। আশা করেছিলাম, বাংলার সঙ্গে না হোক, অন্য কোন দলের বিরুদ্ধে আমরা ভাল খেললে দর্শকরা তারিফ জানাবে।"

"কেন? হরজিন্দর বা তুমি যখন পুরস্কার নিলে, তখন তো অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছে।"

ইন্দর কিছু বলার আগেই গুরদেব বললেন, "অনেক খেলেছি। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম রানার্স আপের ট্রফি দেওয়ার আগে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পুরস্কার দেওয়া হল।"

ইন্দর তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন, "এসব সামান্য ব্যাপার। এখানে আমাদের থাকার ভাল ব্যবস্থাই ছিল। মাঠও সুন্দর। দর্শকরাও ভাল। জানি না, আমাদের খেলা এখানকার লোকেদের ভাল লেগেছে কিনা।"

গাড়ি ছাড়ার সংকেত জানাচ্ছে। বিদায় নেওয়ার পালা। উঠে দাঁড়ালাম। ইন্দরও এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "১৯৭৪ সালে বাংলা তোমাদের কাছে ৬—০ গোলে কেন পরাজিত হল?"

"ঐদিন বাংলার ছেলেরা কিছুই খেলেনি। বাংলা প্রথমার্ধে তিন গোলে পিছিয়ে ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা যদি আরও ছ গোল খেত, তাহলেও বলার কিছু ছিল না।"

গুরদেব এগিয়ে এলেন। বললেন, "দাদা, কাশ্মীরে তো মাস কয়েক বাদেই আবার খেলার আসর বসবে। তখন আসবেন। দেখবেন, আমরাই জাতীয় ফুটবলের ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরব।"

ফোটো তপন দাশ

মনে রাখার মত টেস্ট সিরিজ

চিরঞ্জীব

অ্যাডিলেড টেস্টের তৃতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৬৯ রানে শেষ হতেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বললেন : ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ ভারতের পরাজয় বাঁচাতে পারবে না। কারণ এর আগে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল ৫০৫ রান। বিশেষজ্ঞদের যোগ্য জবাব দেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা দ্বিতীয় ইনিংসে। তাঁরা প্রমাণ করেন, শুধু ঈশ্বর নয়, জিততে গেলে চাই লড়াকু মনোভাবও।

ভারত অবশ্য পঞ্চম টেস্টে জেতেনি, কিন্তু রীতিমত শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রথমত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পর পর দুটি টেস্টে হেরে পরের দুটিতে জয়—ভারত-ক্রিকেটে কখনও ঘটেনি। শেষ টেস্টে ভারত জিতলে সেটা বিশ্ব-নজিরের সমান হত। ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানই কেবল পর পর দুটি টেস্টে হেরে পর পর তিনটি টেস্টে জিতেছিলেন।

এবারের সিরিজ বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ১৯৭৫-এর ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজকে। সেবারও ২—২ হওয়ার পর পঞ্চম টেস্টে দারুণ উত্তেজনা। ভারত অবশ্য শেষের ম্যাচটি ধরে রাখতে পারেনি। এবারও তাই ঘটল। তবে এবারের মত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রামী ভারতকে কদাচিৎ দেখা গেছে। এবারের প্রথম দুটি টেস্টে আমাদের হার দুটি অগৌরবের ছিল না। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় অবিচল চিত্তে ব্যাট করেছেন, বল করেছেন, ফিল্ড করেছেন। কার কথা বলব—বেদী, গাভাসকার, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, মহীন্দর অমরনাথ, মদনলাল, দিলীপ বেঙ্গসরকর, চেতন

বেদী ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

বিশ্বনাথ ফোটো তপন দাশ

টমসন

চৌহান, বিশ্বনাথ, কিরমানি—এদের সম্মিলিত প্রয়াস অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে হারলেও অস্ট্রেলিয়ার দর্শকরা অভিনন্দিত করেছেন ভারতকে। আর তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে? ভারতের জয়ে মনে হয়েছে—এ যেন কলকাতায় বা বোম্বাইয়ে জয়। এই দর্শকরা যেন ইডেনের বা ওয়াংখেড়েরই। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মাথায় তুলে নিয়ে ওঁরা নেচেছেন।

সত্যি কথা, এবার অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন না চ্যাপেল, ওয়াল্টার্স, লিলি, ওয়াকার, প্যাসকো, গিলমোর, মার্শ। কিন্তু তা বলে কি দল দুর্বল ছিল? টুহি ও ক্লার্ক নিশ্চয়ই ওঁদের অপেক্ষা কম শক্তিমান নন। কোন্ অংশে ছোট খেলোয়াড় ডারলিং বা ইয়ালপ?

আবার অ্যাডিলেড টেস্টের কথায় ফিরে আসি। এই পরাজয়টিও প্লানির নয়। প্রথম ইনিংসে ভারত যদি বড় রানের ইনিংস গড়তে পারত, তা হলে ৪৭ রানে পরাজয় তো হতই না, সিরিজ চলে আসত আমাদেরই অনুকূলে। ছয়দিনের এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতের প্রতি অবিচারও কম হয়নি। সিরিজে, আম্পায়ারের কতকগুলি সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন বেদী ও তাঁর সতীর্থরা, বিশেষত এই পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে। তৃতীয় দিনে খেলার শেষে বেদী কড়া সমালোচনা করেছেন আম্পায়ার রিচার্ড ফ্রেঞ্চ-এর। বেদীর অভিযোগ শুধু তাঁর দলের ব্যাটিংয়ের সময় নয়, ভারত যখন ফিল্ড করছিল, তখনও।

প্রথম ইনিংসে মহীন্দরের ক্যাচ ধরেছিলেন কোজিয়ার মাটি ছুঁয়ে বল উপরে উঠলে, সিম্পসন একইভাবে ধরেছিলেন ঘাউড়ির ক্যাচ। বেদীর দ্বিতীয় বলেই টুহি কট বিহাইণ্ড হন। অ্যাপীল হলে আম্পায়ার রিচার্ড মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। সিম্পসনকে এল বি ডবলিউ আউট দেওয়া হয়নি। ওপেনার ডার্লিংও প্রসন্নর সোজা বল প্যাডে আটকে ছিলেন। আম্পায়ার তখনও নির্বাক।

আম্পায়ার রিচার্ড বোধ হয় শুরু থেকেই ভেবে নিয়েছিলেন ভারত জিতলে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের মুখে চুনকালি পড়বে। সুপার টেস্টের উদ্যোক্তা কেরি প্যাকার তা হলে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে রক্তচক্ষু দেখাবার সুযোগ পাবেন। তাই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়—অস্ট্রেলিয়াকে বাঁচাতেই কি আম্পায়ার ওই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? এতে কিন্তু অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের মর্যাদা বাড়তে পারে না।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট হতমান—এমন কথাও বলছি না। আম্পায়ারের ওই সিদ্ধান্তগুলি বাদ দিলেও শেষ টেস্টে বুড়ো সিম্পসনের আবার শতরান বাহবা পাওয়ার মতন। আর ইয়ালপ তো ১২১ করলেন। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪৫ করতে বিশ্বনাথ ৭৩, মহীন্দর ৮৬, বেঙ্গসরকর ৭৮ ও কিরমানি ৫১ রান যেভাবে তুলেছেন, তার তুলনা নেই। ফলো অনের সুযোগ সত্ত্বেও সিম্পসন ভারতকে দিয়ে তা করাননি এই কারণেই। সিম্পসন চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করবার ঝুঁকি নিতে চাননি। উপরন্তু অস্ট্রেলীয় বোলাররা ক্লান্ত ও আহত ছিলেন তখন।

এই নিয়ে ভারত—অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মোট ৩০টি টেস্ট হল ১৯৪৭-৪৮ থেকে। অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ১৯টি-তে, ভারত ৫টি-তে। বাকি অমীমাংসিত।

সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার নীট লাভ কিছু নতুন খেলোয়াড়। মার্চে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে হয়তো তাঁরাই হবেন দলের প্রধান হাতিয়ার। প্যাকারের পরিকল্পনার কিছু ক্ষতি হল। শুধু দেখা দরকার পুরনোরা কী করেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোলবোর্ডও নিশ্চয়ই নতুন মুখের সন্ধান করবেন আগামী মরসুমের জন্য। তবে যাঁরাই আসুন, দলগত সংহতি চাই, যা দেখা গেছে এবার অস্ট্রেলিয়া সফরে।

বিশ্ব-হকিতে ভারত কি আবার চমক লাগাবে ?

সুব্রত সরকার

বিশ্ব-কাপ হকির খেলা যেখানে চলবে

এক সময়ে, এই ধরো বছর কুড়ি আগে, ভারত হকি খেলায় নিঃসন্দেহে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তবে সেইসব দিন বহুকাল গত হয়েছে। সাতবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বছর দেড়েক আগে মণ্ট্রিয়ল গেমসে এমন বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল যে, পরবর্তীকালে দলে অনেক ওলট-পালট করা ছাড়া উপায় ছিল না। ভারত তিন বছর আগে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেও এই মাসের ১৮ তারিখে দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ারস আয়োজিত চতুর্থ ওয়ার্ল্ড কাপ হকি টুর্নামেণ্টে সফল হতে পারবে কি ? কেউই তেমন আশা রাখছে না অবশ্য।

ভারত আগেও অন্য দেশের কাছে হেরেছে, তবে মণ্ট্রিয়লে অস্ট্রেলিয়ার কাছে যাচ্ছেতাইভাবে হারার (৬—১) ফলে দুটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এক, ভারত কৃত্রিম ঘাসের মাঠে খেলার কায়দা ঠিক রপ্ত করতে পারেনি। দুই, খেলোয়াড়দের দক্ষতা থাকলেও কৌশল অর্থাৎ ট্যাকটিকসের দিক দিয়ে অন্য দেশগুলি অনেক এগিয়ে গেছে। এইবার আর্জেন্টিনায় বিশ্বকাপের খেলা হবে আসল ঘাসের মাঠে, তাই এক দিক দিয়ে বাঁচোয়া ; তবে ফিলিপস-এর নেতৃত্বে খেলোয়াড়রা আধুনিক হকি কতখানি নিজস্ব দক্ষতার সঙ্গে মেলাতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা হবে বুয়েনস এয়ারস মহানগরীর ঠিক মধ্যিখানে অবস্থিত পোলো মাঠে। ওই বিরাট প্রাঙ্গণে সাতটি হকির মাঠ ছক কেটে বার করা হয়েছে। পোলো ক্লাব প্রাঙ্গণের পয়লা নম্বর সেকটরে দুটি হকির মাঠ থাকবে, যেখানে ১২,০০০ দর্শক-আসন হবে, আর সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হবে। তাছাড়া দুই নম্বর সেকটরে আরও চারটি হকির মাঠে প্রতিযোগিতার খেলা হবে, আর পঞ্চমটিতে চলবে অনুশীলন। ওখানে পোলো খেলা হয় শুধু অক্টোবর আর নভেম্বরে। প্রাঙ্গণটি আর্জেন্টিনার সেনাবাহিনীর সম্পত্তি, তাই সেটি সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই মাঠে বছরে তিনরকমের ঘাস বপন করা হয়। মণ্ট্রিয়লে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে অন্তত মাঠের দিক থেকে ভারতের অসুবিধার কারণ থাকা উচিত নয়।

অবাক কাণ্ড, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দল নিউজিল্যাণ্ড বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ, বুয়েনস এয়ারসে যাতায়াতের যে মোটা খরচা হবে তা দেশের হকি সংস্থা দিতে পারবে না ; তাছাড়া তাদের খেলোয়াড়রা সারাবছর হকি খেলার মতন ছুটি পায় না কর্মক্ষেত্র থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নও টুর্নামেণ্টে খেলবে না বলে জানিয়েছে। তাদের ভাল খেলোয়াড়দের অনেকেই নাকি প্রতিযোগিতা চলার সময়ে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এই জন্যে গত বছর রোমে অনুষ্ঠিত ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল কাপ থেকে আরও দুই দেশ—কানাডা আর ইতালি—বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েছে।

চোদ্দটি প্রতিযোগী দেশ দুই গ্রুপের লীগ পর্যায়ে খেলবে। ভারতের সঙ্গে পুল 'এ'-তে আছে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানি আর পোলাণ্ড। আর পুল 'বি'-তে আছে আর্জেন্টিনা আয়ারল্যাণ্ড ইতালি মালয়েশিয়া হলাণ্ড আর পাকিস্তান। প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে একটি খেলা হবে, তারপর বিরতি-দিবস নিয়ে ২৯ মার্চ পর্যন্ত খেলা চলবে। এক-এক দিন ছটি করেও খেলা থাকবে। ত্রিশ তারিখ যদি কোন রি-প্লের প্রয়োজন হয় খেলা হবে, আর ৩১ মার্চ সেমি ফাইনালের পর ফাইনাল খেলা হবে ২ এপ্রিল। ভারতীয় দলের বুয়েনস এয়ারসে পৌঁছুনোর কথা ১৪ মার্চ। আমাদের খেলোয়াড়রা আর্জেন্টিনায় সপ্তাহ-তিনেক কাটাবে।

আর্জেন্টিনার জাতীয় হকি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে ১৯০৮ সালে। এই বছর তার ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন আর্জেন্টিনার প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান সত্ত্বেও চতুর্থ ওয়ার্ল্ড কাপ সেখানেই হবে বলে ঠিক করে। তিন বছর আগে কুয়ালালামপুর বিশ্বকাপের সময় অধিকাংশ প্রতিযোগী দেশ গরম, আর বৃষ্টিভেজা উঁচু-নিচু মাঠের ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল। এবার তেমন হবে বলে মনে হয় না। মার্চে আর্জেন্টিনায় বৃষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে ; তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। আশ করা যায়, এই আবহাওয়া এশীয় ও পশ্চিম দেশগুলির মনোমত হবে। পোলো ক্লাবের হকি মাঠ নিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারাও প্রচার চালাচ্ছেন অনেকদিন ধরে।

বিশ্বকাপটি পাকিস্তান এফ আই এইচ-কে দান করে। প্রথম বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল লাহোরে, ১৯৭০ সালে। হয় এক বছর পর বার্সিলোনায়। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ভারত সেমিফাইনালে তাদের কাছে হারার পর তৃতীয় স্থান লাভ করে। দুই বছর পর আমস্টারডামে ভারত সেমি ফাইনালে পাকিস্তানকে হারায় ; তারপর হলাণ্ডের সঙ্গে ফাইনাল ২—২ ড্র হওয়ার পরে টাই-ব্রেকারে পরাজিত হয়। সেবার ভারতের অধিনায়ক ছিলেন আউটসাইড-রাইট গণেশ। কিন্তু বার্সিলোনা দলের ক্যাপটেন অজিতপাল সিং আবার ভারতের দলনায়ক হন তৃতীয় ওয়ার্ল্ড কাপে। আর কুয়ালালামপুরে ভারত পাকিস্তানকে ফাইনালে ২—১ গোলে হারিয়ে কাপ জেতে।

আর এবার ? দলে অনেক নতুন মুখ—গতবারের কাপ বিজয়ী টিমের খালি ফিলিপস্‌ই রয়ে গেছেন। কেউ তেমন আশা করে নেই সত্যি, কিন্তু ভারত কি আবার বিশ্ব হকিতে চমক লাগাবে ?

খেলার খবর, ছবিতে

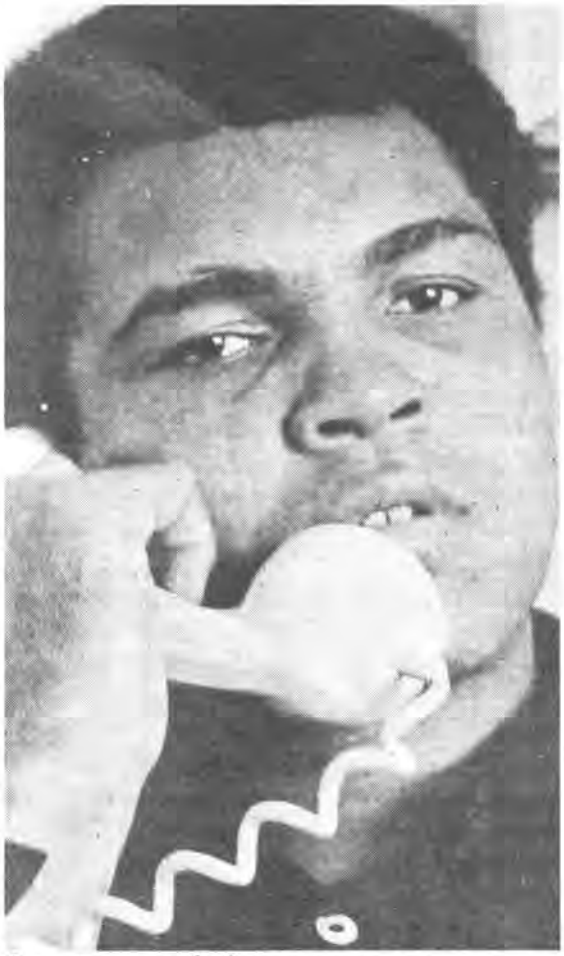

ফোটো অলক মিত্র

বক্সিং ঃ 'অপরাজেয়' আলি স্পিংক্সের কাছে পরাজয় মেনেছেন।

ফুটবল ঃ কলকাতায় এবারে কোন্ তারকা কোন্ দলে?

ফোটো সুতোন সেন

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

প্যানজিয়া

পৃথিবীতে ছটি মহাদেশ আছে—অ্যান্টার্কটিকাকে ধরলে সাতটি। কয়েকটি মহাদেশের মধ্যে বেশ দূরত্ব আছে, কিন্তু এইসব মহাদেশের গাছপালা, জীবজন্ত ও শিলা অনেক জায়গাতেই একইরকম। এই মিল দেখে অনেক ভূবিজ্ঞানী মনে করেন যে, বহু কোটি বছর আগে এই মহাদেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মহাদেশগুলির যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্ভব—একথা আগেকার ভূবিজ্ঞানীরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা ভাবতেন, ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু হয়ে উঠে স্থলভাগের সৃষ্টি করতে পারে, কিম্বা কোন কারণে নীচে বসে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে যেতে পারে। কিন্তু ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ফরাসী ভূবিজ্ঞানী সিনডার প্রথম এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মহাদেশগুলি শুধু ডুবে যেতে বা উঁচু হয়ে উঠতেই পারে না—পাশের দিকেও সরে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কথায় তখন কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এর অনেক বছর পরে ১৯০৮ সালে টেলার আমেরিকাতে ও ১৯১০ সালে ওয়েগনার জার্মানিতে এই অভিমত সমর্থন করলেন।

বিখ্যাত জার্মান ভূবিজ্ঞানী ওয়েগনারের মতে কয়েক কোটি বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সব স্থলভাগ যুক্ত হয়ে একটি মহাদেশের সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই দেশটির নাম রেখেছিলেন 'প্যানজিয়া'। তারপর প্রথমে সেটি খণ্ড খণ্ড হল এবং সর্বশেষে খণ্ডগুলি একে অন্যের থেকে দূরে সরে গেল। এই বিচ্ছেদ বর্তমান রূপ ধারণ করল মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে। ওয়েগনারের মতে শুধুমাত্র মহাদেশগুলিই নয়—দক্ষিণ মেরুও স্থান পরিবর্তন করেছে। কয়েক কোটি বছর আগে দক্ষিণ মেরু আফ্রিকার ঠিক নীচেই অবস্থিত ছিল। ওয়েগনারের মতে এই খণ্ডগুলির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার গতি ছিল পশ্চিম দিকে আর দক্ষিণ দেশগুলির গতি দক্ষিণ দিকে। এই গতির জন্যে টুকরোগুলির অগ্রভাগে কুঞ্চনের সৃষ্টি হয়েছিল।

ওয়েগনার এই মতবাদের পক্ষে অনেক যুক্তি সংগ্রহ করেছেন। প্রথমত তিনি বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলিকে—ছবিওয়ালা ছোট ছোট কাঠের টুকরো বাচ্চারা যেমন করে একটার সঙ্গে আর একটা যোগ করে ছবি তৈরি করে—ঠিক সেইরকমভাবে একটাকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। দেশগুলি এইভাবে যুক্ত করলে পর্বতমালার মধ্যে যে ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মাটির নীচে যে-সব জীবজন্তুর দেহ চাপে পড়ে পাথর হয়ে গেছে, অর্থাৎ যাকে ফসিল বা জীবাশ্ম বলা হয় সেইসব ফসিল বা জীবাশ্ম এবং শিলাতেও যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

এ সব থেকে এই কথাই অনুমান করা যায় যে, এই দেশগুলি তখন একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু হাজার হাজার মাইল লম্বা সমুদ্রকে সংযুক্ত করবার মতো বিস্তৃত স্থলভাগ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। সেইজন্যে অবিচ্ছিন্ন মহাদেশের কল্পনাই বেশি স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের ওড়িশা, উত্তর পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ, আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও নাটাল, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া একই শ্রেণীর ও একই যুগের হিম-বাহিত শিলা প্যানজিয়ার এই অবিচ্ছিন্নতার কথাই হয়ত প্রমাণিত করে।

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

সিনেমা দেখতে গিয়ে রহস্যময় এক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বরদার। একটা সময় মনে হয় তিনি মৃত, পরেই আবার দেখা যায় তিনি জীবিত। এই অদ্ভুত মানুষটির নাম সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বর এক গবেষণার কাজ নিয়ে রয়েছেন। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক শক্তি থাকে। সেটা কেমন করে হয়—এই তাঁর গবেষণার কাজ। গবেষণা কলকাতার বাড়িতে হয় না—বাইরে দুমকার দিকে একটা সেন্টার আছে, সেখানেই হয়। সিদ্ধেশ্বরের অনুরোধে বরদা শেষ পর্যন্ত দুমকার সেই সেন্টারে যেতে রাজি হল। তবে যাবার আগে জানতে পারল, সেখানে বরদার মতই দেখতে একজন লোক রয়েছে—নাম মহাদেব। লোকটা সন্দেহজনক।

দুমকার কাছে সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টারে এসে প্রথমেই বরদা ভীষণ এক ধাক্কা খেল। যে-টাঙায় করে তারা এসেছিল রিসার্চ সেন্টারে—সেই টাঙার ঘোড়া জায়গা মতন পৌঁছে গিয়ে হঠাৎ খেপে গেল। পরের দিন আবার ফাঁকা মাঠে টাঙাঅলার অদ্ভুতভাবে মারা গেল, আর ঘোড়াটা গেল পালিয়ে। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন, এর মধ্যে মহাদেবের হাত রয়েছে আর রয়েছে সুজন মালাকারের—যাকে কিছুদিন আগে রিসার্চ সেন্টার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর—

৮

পরের দিন খানিকটা বেলায় সিদ্ধেশ্বরের লোক এসে বরদাকে ডেকে নিয়ে গেল অফিস-ঘরে।

সিদ্ধেশ্বর অফিসেই ছিলেন। গতকালের ধকল সামলে উঠতে পারেননি। চোখমুখ বসে রয়েছে, রুক্ষ-রুক্ষ চেহারা।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বসুন। রাত্রে কোনো অসুবিধে হয়নি তো!"

বরদা বলল, "না। আপনি কেমন আছেন? কপালের ঘা?"

"ব্যথা কমছে।"

আরও কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তার পর সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাল টাঙাঅলার ব্যাপারটার জন্যে সারাটা দিন বাইরেই কাটাতে হল। কোনো কাজ হল না। আজ আপনাকে নিয়ে আমাদের এই জায়গাটায় একটু ঘুরব। কাল আপনাকে কার-কার কথা বলেছি যেন?"

বরদা বলল, "দুজনের কথা বলেছেন।"

"ও, হ্যাঁ; মনে পড়েছে। সীতারাম আর গোপীমোহনের কথা বলেছি।" বলে সিদ্ধেশ্বর গতকালের সেই খাতাটা টেনে নিলেন।

বরদার মনে হল, সিদ্ধেশ্বর আগে থেকেই খাতা সাজিয়ে নিয়ে বসে ছিলেন।

খাতার ওপর হাত রেখে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সীতারাম আর গোপীমোহনের কথা আপনার মনে আছে তো?"

ঘাড় হেলাল বরদা। তার মনে আছে। সীতারামের শরীরের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তাঁর ডান কিংবা বাঁ অঙ্গ যেন এক ডান হাতের কোথাও কেটে গেলে বাঁ হাতেরও মোটামুটি সেই একই রকম জায়গা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ে। আশ্চর্য! আর গোপীমোহন—যে লোকটা নাকি মেলায় খেলা দেখিয়ে বেড়াত তার এমনই এক ক্ষমতা যে, বরফের চাঁইয়ের ওপর দশ পনের মিনিট শুইয়ে রেখে তারপর উঠিয়ে নিলে লোকটার শরীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গরম, স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দুজনের কাউকেই স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ফেলা যায় না। এদের যে এ-রকম কোনো ক্ষমতা আছে তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বরদা আপাতত বিশ্বাস করে নিচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর এইসব অবিশ্বাস্য আজগুবি ব্যাপার দেখাবার জন্যেই তো তাকে টেনে এনেছেন।

সিদ্ধেশ্বর খাতার পাতা আর ওলটালেন না, বললেন, "আমি মুখেই বলি, খাতা খোলার দরকার নেই। সীতারাম আর গোপীমোহনের পর রয়েছে আমাদের অর্জুনপ্রসাদ, বংশী মাঝি আর গদাধর রায়। এই পাঁচজন হল আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর করার লোক। এদের আমরা গ্রুপ 'এ'র মধ্যে ফেলি। অবশ্য তার মধ্যেও একটা ইতরবিশেষ রয়েছে।"

বরদা বলল, "অর্জুনপ্রসাদের স্পেশ্যালিটি কী?" বলে হালকা মুখে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "অর্জুনপ্রসাদ বেহারী। তার বাড়ি মুঙ্গেরে। বয়েস বছর চব্বিশ। অর্জুনপ্রসাদ ছেলেবেলায় তার বাবার সঙ্গে তুলোর দোকানে কাজ করত। বাবা মারা যাবার পর সে এখানে-সেখানে কাজ করে বেড়িয়েছে। শেষে ও রেল-স্টেশনে চাওলার কাজ করত। আমরা যখন তাকে নিয়ে আসি, তখন অর্জুনের অসুখ। লোকে বলত, তাকে ভূতে ধরেছে। এখানে আসার পর ধীরে-ধীরে সে ভাল হয়ে ওঠে।"

"তা না হয় হল, কিন্তু অর্জুনপ্রসাদের বিশেষ ক্ষমতাটা কী?"

"সেটা আপনাকে আগে বলব না। নিজের চোখেই দেখবেন।" সিদ্ধেশ্বর এমন মুখ করলেন যেন রহস্যটা চাপা দিয়ে রেখে মজা পাচ্ছেন।

বরদা বলল, "বেশ, স্বচক্ষেই দেখা যাবে।...আপনার অন্য দুই ওয়ান্ডার ম্যানের কথা বলুন—বংশীবদন আর, কী বললেন যেন, গদাধর?" বরদা হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বংশীকে আমরা জোগাড় করেছি কয়লাকুঠি থেকে। তার বাড়ি পাণ্ডবেশ্বর। বংশীর বয়েস বছর পঞ্চাশ। ও চোখে দেখতে পায় না। তার মানে বংশী জন্মান্ধ নয়, একবার আগুনের এক হলকা লেগে তার মুখের চামড়া পুড়ে যায়, চোখও অন্ধ হয়ে যায়। বংশী অন্ধ। আপনি ওকে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু ওই বংশীকে আপনি অন্ধকারে বাইরে নিয়ে আসুন, সে আপনাকে হাতে ধরে এখানকার প্রত্যেকটি জায়গায় নিয়ে যাবে, কোথায় কী আছে বলে দেবে, কে সামনে এসে দাঁড়াল তাও জানিয়ে দেবে। এমন কী—বংশী আপনাকে আকাশের কোথায় কোন তারা ফুটে আছে তাও বলে দিতে পারবে।"

বরদার বিশ্বাস হল না। বলল, "অন্ধরা অভ্যাসবশে অনেক-কিছু পারে।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু কোনো অন্ধই তার অভ্যস্ত জীবনের বাইরে কিছু পারে না। বংশী পারে। আপনি নিজেই দেখবেন।"

বরদা আর ঘাঁটাল না। বলল, "এবার আপনাদের গদাধরের ইতিহাসটা শুনি।"

শিশুদের- কিশোরদের- যত ছোটদের বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর-রচনাবলী

সমগ্র কিশোর-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড ॥ দাম ২০·০০

ছোটদের জন্যে একটি দারুণ সুখবর! তোমাদের প্রিয় টেনিদার ছোটবড় যাবতীয় কাহিনী এবার একসঙ্গে তোমরা হাতের মধ্যে পাচ্ছ। হ্যাঁ, একসঙ্গে; তবে একটি মাত্র খণ্ডে নয়, একাধিক খণ্ডে—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সমগ্র কিশোর-সাহিত্য'য়। অবশ্য শুধুই টেনিদার কাহিনী মাত্র নয়, নারায়ণবাবুর ছোটদের জন্যে লেখা সব রকমের লেখাই এতে থাকছে। যেমন, এই প্রথম খণ্ডে তিন-তিনটি বাঘা-বাঘা উপন্যাস 'অন্ধকারের আগন্তুক', 'চার মূর্তি', 'চার মূর্তির অভিযান' আর পাক্কা পঁচিশটি, মানে পুরো কোয়ার্টার সেন্চুরি, মজাদার গল্প ছাড়াও আছে প্রচুর কবিতা, ছড়া ও প্রবন্ধ। উপরন্তু, 'গ্রন্থ-পরিচয়' এবং নারায়ণবাবুর নিজের লেখা ভূমিকা—'আমার কথা'।

এই লেখকের ছোটদের অন্যান্য বই :

ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
তপন চরিত ৫·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিরামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·৩০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঝজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ ০০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩৫·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিন্কুর ডাইরি ৪·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কুস্ট্যাল ১০·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "গদাধর পেশায় ছিল কুমোর। বাঁকুড়া জেলার বাড়ি। হাঁড়িকুড়ি গড়ত। হাটে-বাজারে বেচত। তার মা বসন্ত রোগে মারা যায়। মা মারা যাবার পর থেকে গদাধর কেমন হয়ে যায়, খেপাটে গোছের। নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়ত একবার সে কোন শ্মশানে গিয়েছিল এক তান্ত্রিক সাধু দেখতে। তারপর কী হয়েছিল আমরা জানি না, গদাধরও বলতে পারে না। কিন্তু ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা দেয় গদাধর এমন অনেক কিছু আগে থেকে অনুভব করতে পারে যা আমরা পারি না।"

"যেমন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "যেমন, অশুভ কিছু ঘটার আগে গদাধর হঠাৎ আপনাকে বলে দিতে পারে, কী ঘটবে। আপনাকে সাবধান করে দিতে পারে। সত্যি বলতে কী, আমাদের এখানে একজন ছিল, যে গদাধরের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ওকে এখানে নিয়ে আসে। অথচ এমনই কপাল, গদাধর তাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে দুমকা যাচ্ছিল সাইকেলে চেপে। তখন বর্ষাকাল। বাজ পড়ে মারা যায়।"

বরদা বলল, "এ-রকম আর-একজনের কথা আপনি আমায় আগেও বলেছেন।"

"হ্যাঁ, এক সন্ন্যাসীর কথা। সূর্যপূজারী। আমার বাবা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"

"গদাধর কি সেই ধরনের মানুষ?"

"না, গদাধর সাধারণ মানুষ ; খেপাটে। তার কোনো সাধন-ভজন নেই। কখনো-কখনো নিজের মনে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গান গায়, ঠাকুর-দেবতার গান। সে আমাদের এই বাগানটাগান নিয়ে সময় কাটায়। নিজের মতন থাকে। তাকে কেউ কিছু বলে না।"

"আমি বোধ হয় তাকে দেখেছি। বাগানে।"

"দেখতে পারেন।"

সিদ্ধেশ্বর উঠলেন। বললেন, "চলুন, আমরা ওদিকে যাই।"

বাইরে এসে দাঁড়াল বরদারা।

খানিকটা বেলা হয়েছে। রোদ দেখে মনে হয় দশটার কাছাকাছি। আকাশ পরিষ্কার। গাঢ় নীল। উঁচুতে বুঝি চিল উড়ছে। লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছিল। কাছাকাছি কোথা থেকে কাঠ কাটার শব্দ ভেসে আসছিল। বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে কেউ কাঠ চেরাই করছে।

বরদা বলল, "আপনাদের এই পি পি রিসার্চ সেণ্টার বাইরে থেকে দেখলে কেমন যেন আশ্রম-আশ্রম লাগে, মশাই। মনেই হয় না—এখানে কিছু অ্যাবনরমাল লোকজন জুটিয়ে রেখেছেন।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে যারা থাকে তাদের দেখলে আপনি চট করে কিন্তু বুঝতে পারবেন না কারও কোনো অস্বাভাবিকতা রয়েছে। দু-এক জায়গায় অবশ্য পারলেও পারতে পারেন। ...ওই যে দেখুন—ওর নাম গোপীমোহন।"

বরদা তাকাল। টালি-ছাওয়া ব্যারাক-বাড়ির সামনে একটা ছিপছিপে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁক পায়রাকে দানা খাওয়াচ্ছে।

লোকটিকে বরদা কালও দেখেছে। যদিও বরদা এখানে নতুন, তবু পুরো একটা দিন তার এই চৌহদ্দির মধ্যে কেটেছে, নামে না জানুক—চোখে অন্তত সবাইকেই প্রায় দেখেছে কাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনাকে যে জনা পাঁচেকের কথা বলেছি, তারা ছাড়া আরও জনা পাঁচ-ছয় রয়েছে এখানে, যাদের আমরা অতটা নজর করি না, কিন্তু তারাও আমাদের চোখের বাইরে থাকে না। মজাটা কী জানেন বরদাবাবু, সাধারণ মানুষ যেভাবে খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, কাজ করে, এরা এখানে সকলেই প্রায় সেইভাবে থাকে। কখনো-কখনো ওদের মধ্যে কারও

ব্যবহারে ইতরবিশেষ দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপর আলাদা করে নজর দিতে হয়।"

"সবাই কি ওই টালির বাড়িতে থাকে ?"

"না। পাশের বাড়িতেও থাকে।"

"তা আপনাদের এমন কোনো ঘরটর নেই যেখানে এদের ওপর পরীক্ষা চালান ?"

"আছে বই কী। ওই খড়ের ঘরের পাশে, এখান থেকে আড়াল পড়ে গেছে, ছোট ছোট দুটো ঘর আছে। একটায় কিছু ওষুধপত্তর থাকে। অন্য ঘরটায় দরকার মতন পরীক্ষা করা হয়।"

"কে করে ?"

"সতীশ।"

"কে সতীশ ?"

"সতীশের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। তাকে দেখেননি আপনি। সে এখানে একটানা থাকে না। সপ্তাহে দুবার করে আসে। যে দিন আসে, সেদিন থেকে যায়। আজ তার আসার দিন। নয়ত কাল আসবে।"

"সতীশ কি ডাক্তার ?"

"হ্যাঁ। ডিগ্রী আছে। আবার সাইকোলজিস্ট।"

বরদা কোনো কথা বলল না।

দস্যু

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এ-পাড়ার ছোট্ট ছেলে
খুদে এক দস্যু
বড়রা বলেন রেগে
'তুমিই নমস্য !'
কারো বাড়ি ঢুকে পড়ে
কোনো কিছু ভাঙলে
থুতু দিয়ে চেটে বলে,
'জোড়া যায় জানলেই।'
সাজানো খাবার পেলে
দুই হাতে মাখিয়ে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাসে
বাড়িঘর জাঁকিয়ে।
পেটে রস ঢেলে ডাকে
'খেয়ে দেখো মিষ্টি';
মা এসে লাগায় কিল
এ কী অনাছিষ্টি।
গোলমাল হয় শুধু
দিনটুকু ফুরোলেই
কেঁদে বলে, "বাবা, কেন
সন্ধেটা করলে ?"

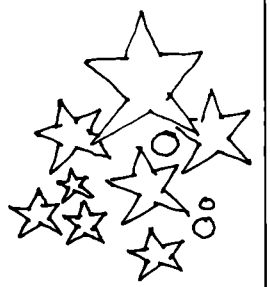

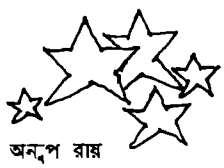

ছবি অনুপ রায়

টালি দেওয়া বাড়িটার কাছাকাছি এসে সিদ্ধেশ্বর বললেন, এখানে যারা আছে তারা মানুষ হিসেবে যতই অদ্ভুত হোক, সকলেই প্রায় সরল সাধারণ, লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না, কেউ কেউ নিরক্ষর। আমি এদের কাছে বলব, আপনি জলের পাম্প কম্পানির লোক, কলকাতা থেকে দেখতে এসেছেন, জলের কী ব্যবস্থা করা যায়। ওরা কেউ কিছু বুঝবে না। আপনাকে কোনো গোলমেলে কথাও জিজ্ঞেস করবে না। মহাদেবই আপনাকে জ্বালাতে পারে। ওই লোকটাই ধুরন্ধর, শঠ। একটা জিনিস আপনি লক্ষ করবেন, যতক্ষণ আমি আপনার কাছাকাছি থাকব, মহাদেব এ-পাশে ঘেঁষবে না। আপনি কি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন ?"

"না," বরদা মাথা নাড়ল। মহাদেবকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

"কাল বিকেলে ওকে দেখেছিলেন ?"

"লক্ষ করিনি। তবে চোখে পড়লে মনে থাকত।"

"কাল থেকেই ও গা ঢাকা দিয়ে আছে।"

"কেন ?"

"টাঙাঅলা।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। "টাঙাঅলা তো ওর কোনো ক্ষতি করেনি।"

"না," মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর, "টাঙাঅলা ওর কোনো ক্ষতি করেনি।"

"তবে ?"

সিদ্ধেশ্বর অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তার ক্ষতি করতাম। আপনাকে আমি যখন নিয়ে এলাম এখানে, তখন থেকেই ও বুঝেছে ওর সর্বনাশ করার জন্যেই আমি আপনাকে এনেছি।"

বরদা ভাল বুঝতে পারল না কথাটা। বলল, "আপনি যদি এতই বুঝেছিলেন তা হলে—"

বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার দুটো ভুল হয়েছিল। বড় ভুল। আমি বুঝতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি মহাদেব আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করবে, আর এই রকম ভয়ংকর এক শিক্ষা। আগে বুঝতে পারলে টাঙাঅলাকে আমি বাঁচাতে পারতাম।"

বরদা বলল, "অন্য ভুলটা কী করলেন ?"

"সুজন মালাকার। আমি কল্পনাই করিনি সুজন মালাকার আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। এখন বুঝতে পারছি, ওই মহাদেব শয়তান সুজনকে পুষে রেখেছিল। মানুষ যেভাবে তার ডালকুত্তা পোষে, মহাদেব সেইভাবে আমাদের চোখের আড়ালে সুজনকে পুষছিল। তাক বুঝে তাকে লেলিয়ে দিয়েছে।"

বরদা কথা বলতে পারল না। সিদ্ধেশ্বরের চোখমুখ যেন রাগে, ঘৃণায়, ক্ষোভে টকটকে হয়ে উঠেছে।

মাত্র কয়েক পা হেঁটে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "বরদাবাবু, আমার প্রথম কাজ হবে সুজনের খবর নেওয়া। সে এখানে কোথায় আছে ? কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে ? কাল সে কোথায় ছিল ? কখন সে টাঙাঅলার গাড়িতে চেপেছে ?"

বরদা বলল, "এসব খবর আপনি কার কাছে পাবেন ?"

"অর্জুনপ্রসাদের কাছে।"

"অর্জুনপ্রসাদ কি মহাদেবের দলে ?"

"না। কিন্তু অর্জুনপ্রসাদ পারে। ওর এই ক্ষমতা আছে। যদি ভগবান দয়া করেন, অর্জুন আমাদের অনেক কিছু বলে দিতে পারবে। চলুন।"

বরদা কিছুই বুঝল না, সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

টুবলুর গোয়েন্দাগিরি

মঞ্জিল সেন

লোকটার হাবভাবে কেমন যেন খটকা লাগে টুবলুর। আগে কখনও দেখেনি ও লোকটাকে। গায়ের রঙ শ্যামলা, একমুখ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। একটা চিত্তির-বিচিত্তির জামা চাপিয়েছে গায়ে, পরনে চাপা প্যান্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল। বাঁ হাতে শিখদের মতো একটা বালাও আছে। দু-তিন দিন ধরে ঘুর-ঘুর করছে পাড়ায়।

টুবলুর সন্দেহ করার আরও একটা কারণ আছে। হেমেন রায়ের গোয়েন্দা-গল্পের ভীষণ ভক্ত ও, মনে মনে ইচ্ছে, বড় হয়ে ও একজন শখের গোয়েন্দা হবে। তাই ওর বয়সী ছেলেদের চাইতে ওর চিন্তা-ভাবনা আলাদা। টুবলুর বয়স অবশ্য বেশি নয়, চোদ্দ, ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু ওর জ্ঞানের বহরের জন্য বন্ধুরা ওকে রীতিমত সমীহ করে চলে।

সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছে টুবলু, তাই এখন কিছু দিনের জন্য ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। দোতলার বারান্দায় বসলে পাড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায়। তাই দেখে আর গল্পের বই পড়ে সময়টা ওর মন্দ কাটছে না। সেই সূত্রেই লোকটির ওপর নজর পড়েছে ওর। একটা ব্যাপার কিন্তু সত্যিই সন্দেহ-জনক, লোকটা বেলা এগারোটার আগে আসে না। বাড়ির বাবুরা আপিসে আর ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে চলে যাওয়ার পর পাড়াটা যখন খাঁ-খাঁ করে, তখন আসে লোকটা। বার দু-তিন রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড় টহল দেয়, দু' পাশের বাড়ি-গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর চলে যায়। কী মতলব লোকটার!

মায়ের কাছে কথাটা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারে না টুবলু। মা হয়ত বিশ্বাসই করবে না, বলবে, ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে। তা ছাড়া মা একটু ভিতু প্রকৃতির, কী দরকার মাকে মিছিমিছি বিব্রত করার। কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করে ওর।

ঠিক চতুর্থ দিন ঘটল ঘটনাটা। টুবলু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় একটা বই খুলে বসে ছিল, কিন্তু ওর চোখ দুটো ছিল রাস্তার ওপর। আজ লোকটা আসতে দেরি করছে।

তারপরই চমকে উঠল ও। লোকটা আসছে, তবে একা নয়, ওর সঙ্গে আরো দুজন। তাদের চেহারাও সুবিধের নয়, কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব। টুবলুর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল।

ওরা গট-গট করে এগিয়ে আসছে, একজনের হাতে একটা থলি।

লোক তিনজন ওদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল টুবলুর, একটা বিপদের আশঙ্কায় খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম।

না, ওদের বাড়ি নয়। ওদের ঠিক উলটো দিকের বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা, সন্দেহজনকভাবে তাকাতে লাগল এপাশ-ওপাশ। তারপরই ওদের বারান্দার দিকে। ভাগ্যিস টুবলু বুদ্ধি করে বই দিয়ে মুখটা আড়াল করেছিল, যেন ওদের দেখতে পায়নি, বইয়ের পাতায় ডুবে আছে। আসলে বইয়ের ঠিক ওপর দিয়ে সব কিছুই ও লক্ষ করছিল।

টুবলুদের সামনের বাড়িটা তেতলা। একতলায় থাকেন অনিমেষবাবু। তাঁর ছোট ছেলে গদাই টুবলুর বন্ধু। দোতলায় থাকেন এক মাদ্রাজী পরিবার। নতুন এসেছেন এই পাড়ায়, শুধু দম্পতী স্ত্রী। দুজনেরই বয়স কম, বোধহয় নতুন বিয়ে হয়েছে। অনেক মালপত্তর এসেছে, দামী দামী সব জিনিস। বয়স কম হলেও ভাল চাকরি করেন নাকি ওই মাদ্রাজী ভদ্রলোক, গদাইয়ের মুখে শুনেছে টুবলু। তেতলায় থাকেন বাড়িওলা, রামদাসবাবু।

একতলার ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই একটু সরু ঢাকা গলি মতো, তার-পরই সিঁড়ি, তিনতলা পর্যন্ত চলে গেছে। গলির মুখে একটা কোলাপসিবল গেট, সেটা বন্ধ হয় রাত দশটায়। একতলার ফ্ল্যাটের সঙ্গে ওই সিঁড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

লোক তিনজন হঠাৎ ঢুকে পড়ল ওই কোলাপসিবল গেট দিয়ে, কেউ লক্ষই করল না। এক মিনিট। কলিং বেলের শব্দ।

কান খাড়া করল টুবলু, উত্তেজনায় ও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মন বলছে, নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। লোক তিন-জনকে দেখেই ওর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল, ওদের হাব-ভাব ভাল লাগেনি।

পরপর কয়েকদিন কাগজে ডাকাতির খবর বেরিয়েছে। দুপুরে বাড়ির পুরুষরা যখন বাড়ি ছিল না, তখন হানা দিয়ে-ছিল ডাকাতরা। একটা ঘটনায় বাড়ির গিন্নি বাধা দিতে গিয়ে ছোরার আঘাতে ভীষণ আহত হয়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

মেয়েলী গলায় একটা চাপা আওয়াজ হল না? দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ! না, আর কোনো সন্দেহ নেই টুবলুর মনে। এক ছুটে ও ঘরে চলে এল। মা কী একটা কাজ করছিলেন, ওর অমন ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? দৌড়চ্ছিস কেন?"

"মা..." হাঁপাতে হাঁপাতে টুবলু বলল, "তিনটে লোক ...গুণ্ডার মতো...গদাইদের বাড়ির...সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমার মনে হল...একটা চিৎকার শুনতে পেলাম...জোরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ..."

ওর মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল।

"হয়ত মিস্তিরি-টিস্তিরি," তিনি মনে সাহস এনে বললেন।

"না, মিস্তিরি নয়। ওদের একজন তিনদিন ধরে আমাদের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিল, সব বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল, আমি বারান্দা থেকে দেখেছি...।" আবার হাঁপাতে থাকে টুবলু।

"কী হবে!" ওর মা অসহায়ের মত বললেন।

"আমি লালবাজারে ফোন করব?" টুবলুর বুদ্ধি যেন খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

"লালবাজারের ফোন নম্বর তুই জানিস?"

"হ্যাঁ, একদিন কাগজে জরুরি সব টেলিফোনের নম্বর দিয়েছিল, তার মধ্যে লালবাজারও ছিল। আমি টুকে রেখেছি।"

"কিন্তু," এবার ওর মা একটু বাধো-বাধো গলায় বললেন, "যদি তোর ভুল হয়? পুলিস এসে দেখে, কিচ্ছু না?"

"তাতে না হয় আমাকে একটু বকাবকি করবে, কিন্তু যদি সত্যিই কিছু হয় আর আমরা জেনেশুনে চুপ করে থাকি, তবে...?"

"তোর বাবার আপিসে একটা ফোন করলে হত না?"

"এখন আর সময় নেই মা," টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিল টুবলু।

ওর ভাগ্য ভাল, একবারেই লালবাজার পেয়ে গেল। টুবলু ঝড়ের মতো সব কিছু বলে গেল। ওদের বাড়ির নম্বর, ওর নাম, রাস্তার নাম, নিশানা, কিছুই বাদ দিল না। হেমেন রায়ের জয়ন্তর মত ওর মাথা খেলতে শুরু করে দিয়েছে।

"আমরা কাছাকাছি বেতার ভ্যানকে খবর দিচ্ছি, এখুনি যাবে, আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকুন, বাড়িটা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করবেন।" লালবাজার অনুরোধ করল।

টুবলুর নিজেকে বড় বলে মনে হল, পুলিসের লোক ওকে আপনি করে বলেছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ও রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এদিকে সামনের বাড়িটায় সত্যিই তখন কী হচ্ছিল?

কলিং বেলটা বেজে উঠতেই মাদ্রাজী বউটি দরজা খুলে একটু ফাঁক করেছেন। কলকাতায় নতুন এসেছেন, হালচাল কিছুই জানেন না।

দরজা ফাঁক হতেই ঘরে ঢুকে পড়ল তিনজন লোক, বউটিকে ধাক্কা দিয়েই। বউটি চিৎকার করবার জন্য হাঁ করলেন, কিন্তু একটা থাবা চেপে ধরল হাঁ-করা মুখ। আরেকজন লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা, তারপর ছিটকিনি তুলে দিল। তৃতীয়-জন একটি ছোরা ধরল বউটির নাকের ডগায়। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, বাড়াবাড়ি করলেই নাকটা কেটে শূর্পণখা করে দেবে। দু চোখ বড় বড় হয়ে গেল বউটির, গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, তারপরেই মূর্ছা। চটপট একটা বড় তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ বেঁধে ফেলল একজন।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে সারা ফ্ল্যাটটা তারা তছনছ করল। দামী জিনিসপত্তর যা পেল ভরল বড় একটা থলিতে। ভাল জামা-কাপড় একটা বোঁচকায় বেঁধে নিল। বউটির ততক্ষণে জ্ঞান হয়েছে, ফ্যালফ্যাল করে দেখছেন ওদের কাণ্ডকারখানা।

জিনিসপত্তর নিয়ে ডাকাতরা খুশি মনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভাল দাঁও মারা গেছে। একজন দরজাটা একটু ফাঁক করে মাথা গলিয়ে বাইরেটা দেখে নেবে, তারপর পথ পরিষ্কার বুঝলে ভাল মানুষের মতো নেমে যাবে। বোঁচকাটা একজন মাথায় নিয়েছে, যেন বাড়ি থেকে ধোপা বেরুচ্ছে।

দরজাটা ফাঁক হতেই একটা চকচকে কালো রিভলবারের নল লোকটার বুকে চেপে বসল, চমকাবারও সময় পেল না সে। ওই অবস্থাতেই তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে আরও কয়েকজন ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর, সবাই সশস্ত্র। চোখের নিমেষে কাবু করে ফেলল বাকি দুজনকে। তারপর তিনজনকেই চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে বাইরের কালো রংয়ের বড় গাড়িটায় তুলল। বাইরে ততক্ষণে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে।

পরদিন খবরের কাগজে টুবলুর ছবি বেরুল, সেই সঙ্গে ফলাও করে ওর বুদ্ধি আর সাহসের কাহিনী। ছবিসমেত কাগজের ছাপা অংশটা বাঁধিয়ে নিজের ঘরের দেয়ালে যত্ন করে টাঙিয়ে রেখেছে টুবলু।

ছবি মদন সরকার

ভূতচতুর্দশী

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। চারদিকে অন্ধকার। কোথাও বিদ্যুতের আলো জ্বলছে না। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। বাড়িতে বাড়িতে ক্ষীণ আলো। বাড়িগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বাড়ি ঘরের চেয়ে ফাঁকা জায়গা ঢের বেশি। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে মোমবাতি অথবা হ্যারিকেনের আলো জোনাকির আলোর মত ছোট-ছোট মনে হচ্ছে। আকাশ পুরাপুরি দেখা যাচ্ছে। শুধু দেখা যাচ্ছে বললে ভুল হয়। আকাশ যেন উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। বিজ্ঞানের চোখে আকাশের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। অথচ এই রাতের অন্ধকারে মনে হচ্ছে, সে যে শুধু আছে, তা নয়, তার প্রভাব যেন আপন সত্তায় অনুভব করতে পারছে পশুপতি। যুগ যুগান্তর ধরে এই আকাশ সহস্র-সহস্র দীপাবলী নিয়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। সব মানুষের পূর্বপুরুষদের সে দেখেছে। উত্তর-পুরুষদেরও দেখছে। কত উত্থানপতনের নীরব সাক্ষী এই আকাশ!

কালীপুজোর ঠিক আগের দিন। বাড়িতে বাড়িতে, বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে আলো জ্বলার কথা। পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই তো তা শুরু হয়। লোডশেডিংয়ের জন্য এ-অঞ্চলে আজ সন্ধ্যায় আলো জ্বলেনি। কিন্তু আলো না-ই বা জ্বলুক, বাজি পোড়ানোর মহলা চলছে ঘরে-ঘরে। কার্তিক মাসের রাত। খোলা অঞ্চলে শীতশীত ভাব খুব আরামদায়ক মনে হচ্ছে পশুপতির। গায়ে হাওয়ার স্পর্শ। হঠাৎ আলো ঝলকে ওঠে। পরক্ষণেই শোঁ-ও-ও করে একটা শব্দ দূর-দূরান্তে ছুটতে থাকে। শব্দ ছুটে যাচ্ছে। যেতে যেতে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বাড়ির দেয়ালে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনির মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হতে হতে চলেছে। শব্দের ধাক্কা যেন পশুপতির গায়ে এসে লাগছে।

পথে লোকজন খুব কম। অন্ধকার চোখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কালো-কালো ঝোপঝাড়। চলতে-চলতে দুই একজন লোকের ধূসর আকৃতি চোখে পড়ছে। স্পষ্ট করে মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে না। তাদের ছায়া-ছায়া আকৃতি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে সারি-সারি ঝাউ গাছ কালো প্রাচীরের মত অঞ্চলটাকে ভাগ করে রেখেছে। ঝাউ-জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে সেই অন্তহীন আঁধারের মধ্যে হঠাৎ অনুভব করল পশুপতি, কে যেন, কারা যেন আশপাশেই রয়েছে। তাকে ঘিরেই কি এদের আনাগোনা?

ভূত-চতুর্দশীর রাতে অশরীরী প্রেতেরা কি ঘুর ঘুর করছে পথে পথে? বাতাসের মধ্যে নিরাশ্রয় হয়ে যারা থাকে, তারাই কি ছায়া-ছায়া মূর্তি নিয়ে আঁধার পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে এখন? অকস্মাৎ আকাশ-বাতাস চকিত করে একটা কুকুর আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। পশুপতির গা ছমছম করতে লাগল।

পশুপতির মনে হল, আজ এই ভূত-চতুর্দশীর রাতে সল্টলেকে না এলেই ভাল হত। এখন ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে

পারলে হয়! কিন্তু না এসেই বা উপায় কী? মা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ছোটমাসির খবরের জন্য। পশুপতির বাবা কাজকর্ম সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন। আবার তাঁকে সাত সকালে খেয়েদেয়ে বেরুতে হয়। কাজেই তাঁর পক্ষে ছোটমাসির খবর নেওয়া সম্ভব নয়। ওরাই বা কেমন লোক? সেই কবে অসুখের খবর দিয়েছে। এখন কেমন আছে, সে কথা জানাবে তো! যাক। ছোটমাসির অসুখ সেরেছে। সে ভাল আছে, খবরটুকু জানতে পারলে মা খুশি হবেন। একটা ভাল কাজ সেরে পশুপতি বেশ আনন্দের সঙ্গেই বাড়ি ফিরছিল। ভূত-চতুর্দশীর কথা মনেই ছিল না এখানে আসার আগে। তা হলে সে আরও আগে বাড়ি থেকে বেরুত। এমন কী, ও-বাড়িতে গিয়েও যদি মনে পড়ত, তবে ছোটমাসির সঙ্গে গল্প করে, আর তিন্নির সঙ্গে খেলা করে সে এতটা সময় নষ্ট করত না।

মনে হল একটা গোরু যেন হেঁচে উঠল কাছাকাছি কোথাও। খুব গোলমেলে ব্যাপার। পশুপতি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করে। পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রেখে সে এগিয়ে চলে। পাকা রাস্তার দুপাশে পাথরের চাঙড় পুঁতে চিহ্নিত করা জমির খালি প্লটে কাশ আর কাশের ঝোপ। প্লটের উপর দিয়ে পায়ে চলার পথে শর্টকাট করার যো নেই। বালিতে পা আটকে যায়। এগুনো যায় না। পাকা-রাস্তার পাশে মাঝে-মাঝেই কাঠের অল্প-উঁচু থামগুলোকে অন্ধকারে কালো-কালো মাথার মত মনে হয়। হঠাৎ দেখে চমকে উঠতে হয়। অশরীরী কারা যেন ওঁত পেতে আছে। সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকে মেরে ফেলবে।

সন্তর্পণে চলতে চলতে একসময় পশুপতি গ্রীনবেল্টের পথে এসে পৌঁছল। গাছপালার সবুজ রঙ বোঝা যায় না। শুধু কালো উঁচু অন্ধকারের পাঁচিল পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। আর একটু হাঁটলেই পুল। পুল পেরিয়েই ভি আই পি রোড। ওই তো ভি আই পি রোডের আলো দেখা যাচ্ছে। লেক-টাউনে পুজো প্যাণ্ডেলের আলো জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে পুলে উঠতে-উঠতেই পশুপতি দেখল পুব আকাশে একটা হাউই ভুশ করে অনেক উঁচুতে উঠে ফুরিয়ে গেল।

খালের দক্ষিণ দিক জুড়ে গ্রীনবেল্টের আঁধার ছায়া। তীরের দিকে কচুরিপানার দঙ্গল। হঠাৎ ভয়ে পশুপতির বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। ভয়ে গা শিউরে উঠল। মনে হল একটা কালো মুণ্ডু জলের উপর ভাসছে। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল সমীরের মুখে শোনা ঘটনাটির কথা। মাত্র কয়েকমাস আগে ঠিক এইখানে নাকি একটা মানুষের কাটা মুণ্ডু ও ধড় পড়ে থাকতে দেখেছিল পুলিস। ও কী! মুণ্ডুটা জলের উপরে নড়ছে? হ্যাঁ একটু-একটু করে এগিয়ে আসছে যেন তার দিকে। একী! পশুপতি সম্মোহিতের মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দৌড়ে পালাবার শক্তিটুকুও তার দেহ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

"কে? এখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কী করছেন?"

প্রশ্ন শুনে পশুপতির সংবিৎ ফিরে এল। সে তাকিয়ে দেখল, একজন হোমগার্ড। তার হাতে বড় টর্চ। পশুপতি আঙুল তুলে নড়ন্ত মুণ্ডুটা দেখিয়ে বলল, "ওদিকে টর্চের ফোকাসটা ফেলুন তো।" সেই আলোতে দেখা গেল, একজন মানুষ গলা-জলে নেমে খালের পার ঘেঁষে জলের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। তার মাথাটা শুধু জলের উপরে। হোমগার্ড বলল, "ওই যে ওর পেছনে একটু দূরে অন্ধকারে খড়বোঝাই আবছায়া নৌকোটা দেখছেন, লোকটা ওই নৌকোর মাঝি। গুন টেনে নৌকোটা নিয়ে ও যাচ্ছে উল্টাডাঙার দিকে। তীরে গাছপালার জন্যে হাঁটা যায় না। তাই জলের মধ্য দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে লোকটা। খুব কষ্ট ওদের, তাই না?

ছবি বিমল দাশ

উট্‌কো ছুট্‌কো

সরল দে

১

উটপাখি সে কেমন পাখি
ছুটতে পারে দম ভোর,
উটের মতন বাড়ায় গলা
উট যেন দুই নম্বর।
চড়ুই বলে, তুইও পাখি
হাতছানি দেয় তোকেও নাকি
ওই দূরে নীল অম্বর?

২

কক্ কক্ কক্ কাকের ছানা
ক্যান রে কেঁদে কক্কাস?
হুতুমথুমো ঠুকরে দিল
ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্কাস?
আর কাঁদে না আর কাঁদে না
কাকের ছানা কাক্কুস,
নইলে তুলো আছাড় দেবে
লাউমাচানের রাক্ষুস ॥

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। **প্রকাশস্থান** ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

২। **প্রকাশকাল** মাসিক

৩। **প্রকাশক ও মুদ্রাকর** বাপ্পাদিত্য রায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

৪। **সম্পাদক** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

৬। **যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :**

(ক) **মালিক** আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

(খ) **মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা** অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, অশনিকুমার সরকার ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

আমি বাপ্পাদিত্য রায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

বাপ্পাদিত্য রায়

১ মার্চ ১৯৭৮ **প্রকাশক**

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

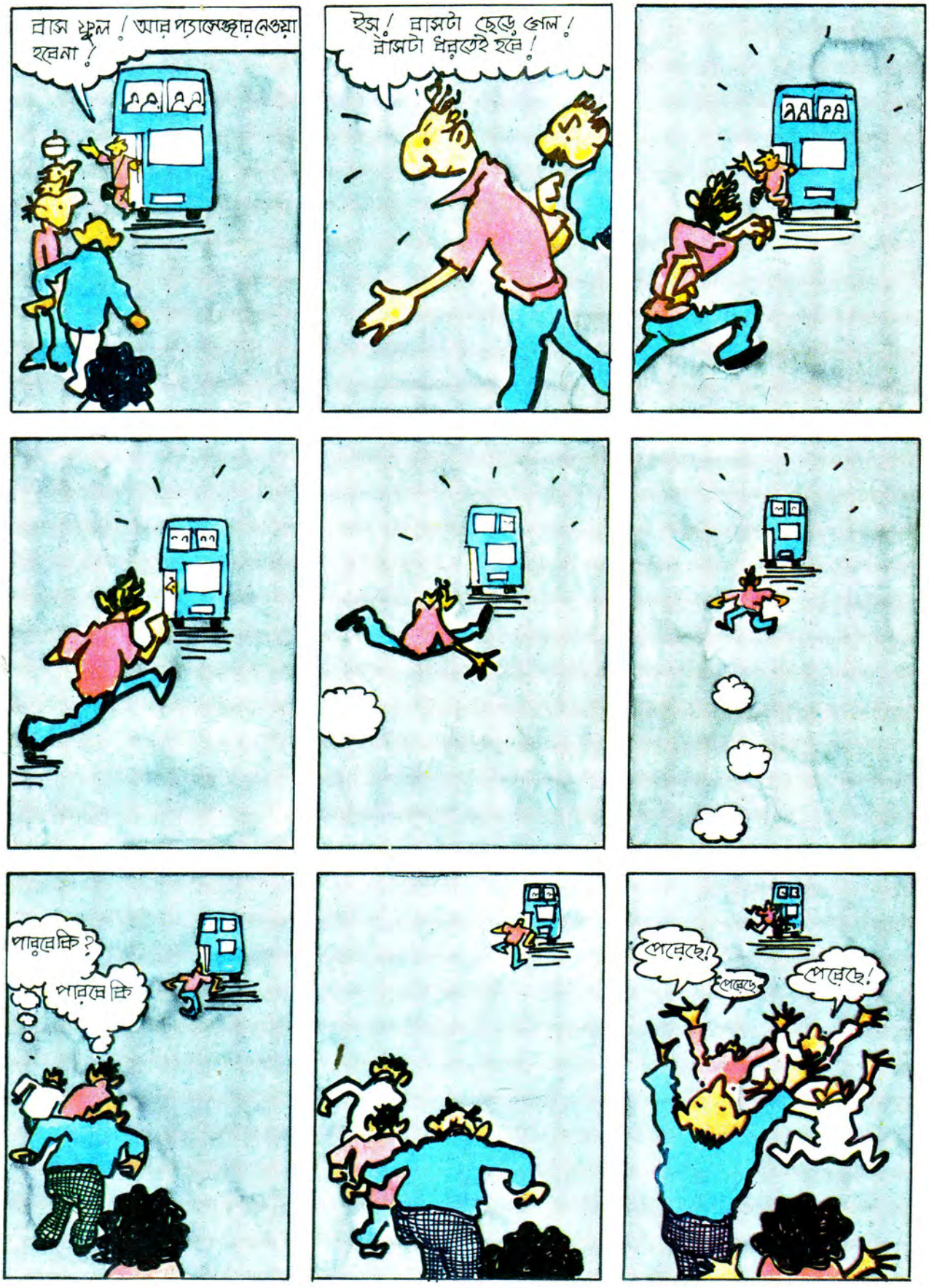

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

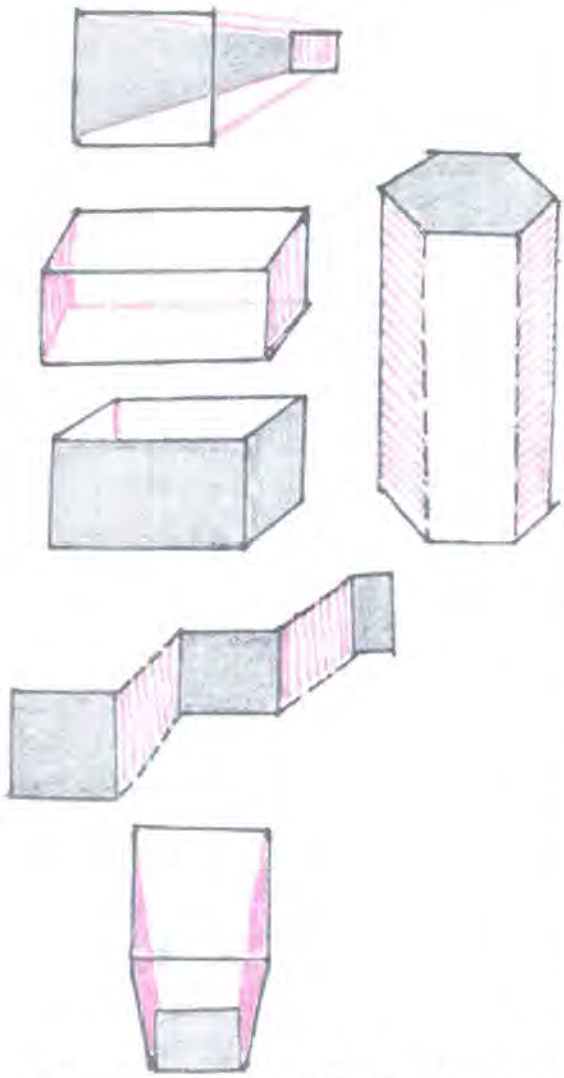

গোল আকার দিয়ে গ্লাস, ঘটি-বাটি আঁকার মজা পেয়েছ। এবার 'চৌকো' দিয়ে নানান আকার। তোমার ইচ্ছেমত ফাঁক রেখে দুটো চৌকো পর পর এঁকে প্রত্যেকটি কাছাকাছি কোণের সঙ্গে জুড়ে দিলে অনায়াসে বাক্স পাবে। তবে সব সময় মনে রাখবে, এই জোড়ার বেলায় উলটো-পালটা হলে সব গণ্ডগোল।

এই জোড়ার পরে রঙ দিয়ে অংশবিশেষ ভরাট করলে নানান ধরনের বাক্স পাবে। কখনও ফাঁকা কখনও বন্ধ। কখনও চৌকো এদিক-ওদিক করে সাজিয়ে জুড়লে পাবে লম্বা লম্বা পাঁচিল। একটু ভেবে করলেই নমুনা দেওয়া ছবির চাইতেও অনেক মজার আকার তৈরি করতে পারবে।

শেখো

কারিগর

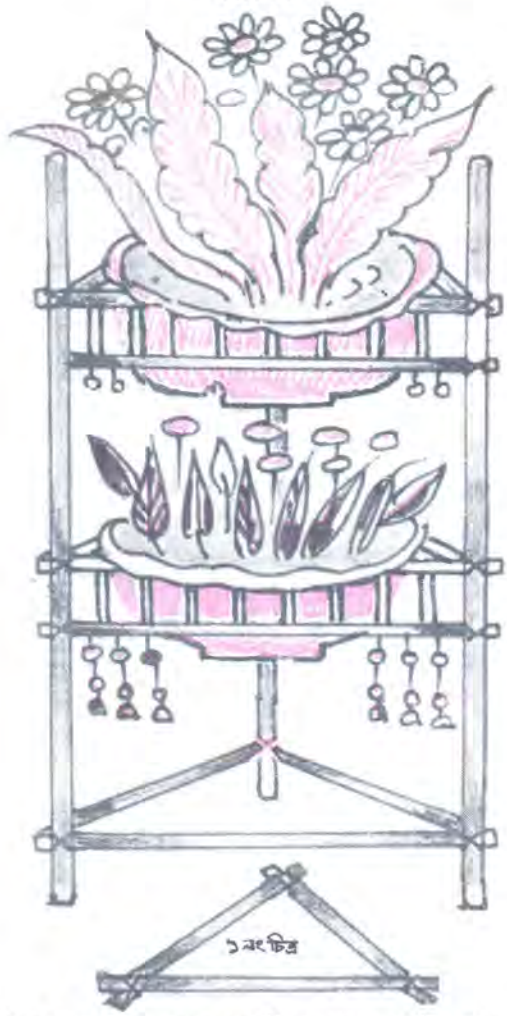

বাঁশের কাজ—ফুলের টব রাখার স্ট্যাণ্ড

বাঁশ দিয়ে বাড়ির দরকারি জিনিসপত্র তৈরি করার সঙ্গে-সঙ্গে, বানাও ঘর সাজাবার স্ট্যান্ড।

শুরু করো—তোমার জোগাড় করা জিনিসের ভেতর থেকে নক্‌শা মাফিক তিনটে লম্বা বাঁশ কেটে কাছে রাখো। এবার এই তিনটে বাঁশকে সমান দূরত্বে রেখে (নমুনা দেখ) বাঁধার জন্য তৈরি করো তিন কাঠির ফ্রেম বা ঘের। (১ নং চিত্র)

স্ট্যান্ডে যতগুলো ধাপ আছে ততগুলো ফ্রেম ছাড়া একটা বেশি বানাবে একেবারে গোড়ায় বাঁধার জন্যে। এবার ঐ লম্বা বাঁশের লাঠিগুলোর আগা ও গোড়ার দিকে ইঞ্চিছয়েক বাদ দিয়ে কোনায় কোনায় বেঁধে ফেলো তৈরি ফ্রেমগুলো। গোড়ার অংশ একটু বেশি ছেড়ে বাঁধলে টবের ফুল-লতা-পাতা ঢেকে যাওয়ার ভয় থাকবে না। বাঁধা শেষ হলে তোমার ইচ্ছেমত নানান ভাবে সাজিয়ে তুলতে পারো। নমুনায় দেওয়া নক্‌শার মতোও করতে পারো। এর সঙ্গে রঙবেরঙের পুঁতি, কাঠের বল এমন কী ছোট ছোট পেতলের ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিলে দেখতে সুন্দর লাগবে।

জেনে রাখো—(১) টবের আকার অনুযায়ী বাঁশের আকার বাছাই করতে হবে। (২) এই ধরনের কাজে লম্বা বাঁশের লাঠির আগা আর গোড়ায় গিঁট থাকলে বাঁশ চট করে ফেটে যাবার ভয় থাকে না। (৩) তিনকোনা ফ্রেমের লাঠি যেন পাতলা না হয়। (৪) লম্বা দাঁড়ানো বাঁশের গায়ের তিন-কোনা ফ্রেম পেরেক দিয়ে আটকে দিতে পারো। লক্ষ রাখবে, পেরেক আটকানোর সময় যেন বাঁশ ফেটে না যায়। (৫) ইচ্ছে হলে সমস্ত স্ট্যান্ডকে এক রঙে বা নানা রঙে রাঙাতে পারো।